‘জয় হে’
মা-মাটি-মানুষ

নির্বাচনী ইস্তাহার

ধর্মনিরপে(তা ● উন্নয়ন ● প্রগতি

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আমাদের আবেদন - মমতা ব্যানার্জী	৫
পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ও আমাদের ভূমিকা	১০
পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ও তৃণমূল কংগ্রেস	১৩
পশ্চিমবঙ্গ ও ও তৃণমূল কংগ্রেস	১৬
চাই মানুষমুখী নীতি - চাই সকলের জন্য উন্নয়ন	১৬
প্রশাসনিক সিপিএমীকরণ	১৮
শিল্প ও বাণিজ্য	২০
কৃষি / সেচ ব্যবস্থা	২৭
ভূমিসংস্কার / সেজ	৩৪
গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন	৩৫
কর্মহীন শ্রমিক ও উন্নয়ন	৩৮
উন্নয়ন-উদ্বাস্তু ও পুর্নবাসন	৩৯
বেকার সমস্যা - স্বনিযুক্তি(ও অসংগঠিত ((ত্রের সম্ভাবনা	৩৯
দারিদ্র দূরীকরণ	৪২
সংখ্যালঘু, তপশিলী জাতি-জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি	৪৩
পিটিটিআই ও পার্শ্বশি(ক-এর সমস্যা	৪৭
পঞ্চায়েত	৪৮
সরকারি কর্মচারী	৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পুলিশ ও প্রশাসনিক সংস্কার	৪৯
আইনের শাসন	৫১
রাজ্যের বেহাল অর্থনীতি	৫৩
অর্থনৈতিক বিকাশের কিছু বিকল্প কর্মসূচি	৫৮
শি(া	৬০
স্বাস্থ্য	৬৩
পরিবেশ	৬৪
দ্রব্যমূল্য ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দরবৃদ্ধি	৬৫
সমবায় ব্যবস্থা - পর্যটন	৬৬
সমাজ ও সংস্কৃতি	৬৬
নারী সমাজ	৬৮
শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের জন্য	৭০
উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য - উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন	৭১
পরিকাঠামো উন্নয়ন	৭৪
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী-গঙ্গাভাঙ্গন রোধ	৭৬
একনজরে তৃণমূল কংগ্রেস যা চায়	৭৮
প্রার্থনা	৮২
তৃণমূল কংগ্রেসের শপথ	৮৩

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯
আমাদের আবেদন

মা-ভাই-বোনেরা,

১৪১৬ - শুভ বাংলা নববর্ষের প্রণাম ও সেলাম। সামনেই **পঞ্চদশ লোকসভা** নির্বাচন। **মা-মাটি-মানুষ আর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-সেলাম- প্রণাম জানিয়ে আবেদন জানাই ধর্মনিরপে(তা-উন্নয়ন ও প্রগতির পথে বাংলার স্বার্থে পরিবর্তন আনুক বাংলার জনগণ। আসুক এক সুন্দর সকাল, মানুষ নিয়ে আসুক পরিবর্তনের ভোর। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার জনগণের কাছে আশীর্বাদ-দোয়া প্রার্থনা করছে।** সিপিএমের বি(দ্ধে বিগত দিনে তুমূল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে যে সিপিএম বিরোধী শক্তি(তৈরি হয়েছে সেই গণদেবতার কাছে আমাদের আবেদন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের 'ঘাসের ওপর জোড়া ফুল' চিহ্নে(ভোট দিয়ে জয়যুক্ত(ক(ন। সিপিএম সরকারের ৩২ বছরের অপশাসন দূর করে প্রগতি-উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বি(দ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস-ই আপনাদের সমর্থনে বিকল্প শক্তি(হিসেবে চিহ্নি(ত হয়েছে। বিগত দিনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবং নন্দীগ্রাম ও বিষ্ণু(পুর বিধানসভা উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আস্থা-ভরসা জানিয়েছেন। আমাদের আবেদন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের আশীর্বাদ-দোয়া ও সমর্থনের ধারাকে আরও জোরদার করে আমাদের দলের প্রার্থীদের জয়যুক্ত(করবেন। আপনাদের ভোটে এ রাজ্যের বর্তমান কুশাসকদের অপসারণের কাজ শু(হোক। বাংলার জীবনে আসুক পরিবর্তনের জোয়ার — আসুক পরিবর্তনের ভোর।

পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন আবার নিয়ে এসেছে পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নেবার এক সুযোগ। ভাবতে অবাক লাগে এই বাংলা একদিন সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রামকৃষ্ণে(র মতো মহাপু(ষ জন্মেছিলেন। স্বাধীনতার পর এই বাংলা ছিল শি(া, স্বাস্থ্য ও শিল্প-সংস্কৃতি-কলা-কৃষ্টিতে দেশের মধ্যে প্রথম। আর বত্রিশ বছর পর এই বাংলা ধর্ষণে, খুনে, (ীলতাহানিতে, ডাকাতিতে, রাহাজানিতে, সন্ত্রাসে দেশের মধ্যে প্রথম। আজ কোনও পিতা-মাতা জানেন না, কাজে বেরোনো সন্তান সন্ধ্যায় ফিরবে কি না! জানেন না, কলেজে পড়তে যাওয়া কন্যা সম্ভ্রম বজায় রেখে বাড়ি ফিরবে কি না! সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শি(ার শেষে এ বাংলায় চাকরি নেই। ল(ল(ছেলে-মেয়ে কাজের সন্ধানে এই রাজ্য ছেড়ে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে। শি(া না পেয়ে, কাজ না পেয়ে শুধু কটা পয়সা রোজগারের আশায় কত ল(মানুষ অন্য রাজ্যে পাথর কাটতে যায়, সোনার কারখানায় কাজ করতে যায় তার হিসেব নেই। নারীপাচারে এই বাংলা প্রথম। অনাহারে আমাদের রাজ্য প্রথম। কর্মহীনতায় এই বাংলা প্রথম। অত্যাচার-নির্যাতনে এই বাংলা প্রথম। রাজ্য জুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

বত্রিশ বছর ধরে যে সরকার মহাকরণের অলিন্দে ঘোরাফেরা করছে তারা দলীয় স্বার্থে রাজ্যের মানুষের যাবতীয় অধিকার হরণ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন কোনও সরকার (মতায় থাকলে সেই সরকারের প্রতিটি পদ(পই ফ্যাসিস্তদের মতো হয়। সিপিএম-এরও আজ সেই একই অবস্থা। মানুষের কাছ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই। শুধুমাত্র নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে ও দিল্লিতে (মতাসীন বিভিন্ন সরকারকে বিভিন্নভাবে তোষামোদ করে ওরা (মতায় থেকে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এটা ঘটছে।

আজ জলের মতো সত্য, নির্বাচনকে কীভাবে প্রহসনে পরিণত করা যায়। কেশপুরে একটা বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম এক ল(রও বেশি ভোটে জেতে কী করে! এটা সামনে আসার পর মানুষ সিপিএমের জোচ্চুরি ধরে ফেলেছে।

পথ দেখিয়েছেন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ভাঙ্গরের কৃষক, চা-বাগান, ডানলপ, বসুমতীর শ্রমিকরা। তারাই সিপিএমের সন্ত্রাসের বি(দ্ধে রাস্তায় নেমে গোটা বাংলার সাধারণ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের বিপর্যয় সেটাই প্রমাণ করে। তবু এখনও বহু এলাকা আছে যেগুলি বোমা, বন্দুক, গুলি আর সন্ত্রাস দিয়ে দখল করে রেখেছে। একটু সুযোগ পেলেই সেখানকার মানুষও বিদ্রোহ করবেন। আজকে মানুষের চোখ যেমন খুলেছে, তেমনি আমরা পাশে পেয়েছি বহু প্রকৃত বামপন্থীকে, যারা প্রকৃত সংগ্রামী। তারা আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের পথে নামছেন। সিপিএম যে অত্যাচারী সে কথা তারা বুঝতে পেরেছেন। আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। এটা একটা বড় দিক। আমরা তাই একা নই। লড়াইটা এভাবে ভাগ হয়েছে যে, একদিকে সিপিএম, অন্যদিকে সিপিএম বিরোধীরা।

মহাকরণের অলিন্দ থেকে গ্রামবাংলার পঞ্চায়েতি রাজ -- সিপিএম আজ গণতন্ত্রের বদলে দলতন্ত্রে পরিণত করেছে। সর্বস্তরে সিপিএমের স্বার্থান্বেষী চত্র(সত্রি(য়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সহ বিশেষ করে একশো দিনের কাজ, বিপিএল তালিকা, গণবন্টন ব্যবস্থা, ঢালাও মদের লাইসেন্স আর অনলাইন লোটো -- সব কিছুতেই চলছে সিপিএম রাজের দাপটে লুটে-পুটে খাওয়ার লড়াই। কৃষকের বুকে গুলি চালাতে ও শ্রমিকের পেটে লাথি মারতে এদের আর কোনও চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। ভাবতে অবাক লাগে এই দল একদিন 'লাঙল যার জমি তার', 'মজদুর ঐক্য জিন্দাবাদ' -- (োগান দিয়ে (মতায় এসেছিল। এই সরকার (মতায় আসার পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি(দেওয়ার কথা বলেছিল। আর আজ যে বিরোধিতা করছে তাকেই জেলে পাঠানো হচ্ছে। আমাদের অন্তত এক ল(তৃণমূল কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

আমরা প্রগতি, উন্নয়ন আর ধর্মনিরপে(তার মন্ত্রে বি(্বাসী দল। আমরা গণতন্ত্রে বি(্বাস করি বলেই শান্তিপূর্ণ পথে স্বৈরাচারী সিপিএম দল ও তাদের পরিচালিত জনবিরোধী সরকারের বি(দ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছি। ২৬ দিন অনশন করেছি। সিঙ্গুরে নর্দমার ধারে পড়ে থেকে ষোলোদিন সত্যাগ্রহ করেছি। প্রতিদিনই মানুষের সঙ্গে থেকেছি এবং থাকব-ও। অর্থ নেই, কিন্তু মানুষ আছে। প্রতিদিন জনসমর্থন আমাদের বাড়ছে। গোটা বাংলার প্রতিটি প্রান্তে প্রতিবাদী মানুষ সিপিএমের বি(দ্ধে সরব। তাই মা-মাটি-মানুষের এই সংগ্রাম, বাংলাকে সিপিএমের হাত থেকে মুক্ত(করার লড়াই ত্র(মশ জোরদার হচ্ছে। সিপিএমকে এবার (মতা থেকে সরাতেই হবে।

বাংলায় আজ সিপিএমের ক্যাডারবাহিনী বামফ্রন্ট সরকারের মদতে দখল করে নিয়েছে সব মানুষের অধিকার। কেড়ে নিয়েছে জীবন-জীবিকা-কৃষিজমি-ইজ্জত, ভূলুণ্ঠিত করেছে গণতন্ত্রকে। মানুষের সব অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সিপিএম আজ বাংলাকে পরিণত করতে চায় বঞ্চনার আমলাশোলে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বঞ্চনাকারী সরকার ছলনা আর প্রতারণা করে শিলান্যাসের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। যে রাজ্য ঋণের দায়ে অর্থনীতিকে তলানিতে ঠেকিয়েছে, সেই রাজ্যে নির্বাচনের মুখে পরিকল্পনাহীনভাবে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই ঘোষণা হচ্ছে 'যাদুকরী' অর্থনৈতিক প্রকল্প। সিপিএমের নেতৃত্বে রাজ্যের ভাঁড়ার ফাঁকা করে টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি তা সিপিএম সরকারের ভাঁওতা আর ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। রাজ্যের অর্থনীতির দফারফা করে মানুষকে প্রতারণা করে মানুষকে প্রতারণা করার রাস্তায় নেমেছে সিপিএম। আমাদের তা (খতে হবে। শিল্পে, কৃষিতে, উন্নয়নে সকলকে নিয়ে পুন(দ্ধার করতে হবে আমাদের রাজ্যের হৃতগৌরবকে।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের অতিরিক্ত দাম, শি(া-স্বাস্থ্য-উন্নয়নের দাবি পদদলিত করে রক্তে(র হোলি খেলেছে সরকার। আদিবাসী, তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণী আজ চরম বঞ্চনার শিকার। সংখ্যালঘুদের কোনও উন্নয়ন সিপিএম সরকার করেনি। সিপিএম জমানায় মা- বোনেদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত। ছাত্র-যুবকদের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়েছে বাংলা ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া।

আমরা চাই মানুষ ভাল থাকুক, বাংলা এগোক, শৃঙ্খলমুক্ত(হোক। সিপিএমের বিরামহীন অত্যাচারের জন্যই বাংলায় আজ আগুন জ্বলছে। উগ্রপন্থীরা বাংলাকে স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে, অস্ত্রের কারখানা তৈরি হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উত্তাল, আদিবাসীরা বিদ্রোহী, সংখ্যালঘুরা (ব্ধ, তপশিলীরা অবহেলিত, বিপন্ন শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষ। তাই এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের। অত্যাচারিত বাংলা মায়ের প্রকৃত রূপকে সামনে আনার সংগ্রামে সামিল রাজ্যের জনগণ। এ লড়াইয়ে জিততে আমাদের হবেই। নিতে হবে সোনার বাংলা গড়ার শপথ। পঞ্চায়েত নির্বাচন আর সাম্প্রতিক নন্দীগ্রাম-বিষ্ণু(পুর পশ্চিম বিধানসভার উপনির্বাচনে সিপিএম ধাক্কা খেয়েছে। **কিন্তু এখনও নন্দীগ্রামের মানুষ তাদের স্বজন-হত্যাকারীদের চরমতম শাস্তির দাবিতে আশায় বুক বেঁধে আছেন। তাপসীর ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে সিঙ্গুর আজও উত্তাল। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি আজও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি নথিভুক্ত(ও অনথিভুক্ত(বর্গাদার এবং (তমজুরদের অধিকার। ঠিক একইভাবে লালগড়ের নিরীহ আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, হত্যার বিচার চাইছেন ঐ অঞ্চলের মানুষ।** তাদের আশাকে আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে। সামনে লোকসভা ভোটে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ভিতকে চুরমার করতে হবে।

সাধারণ মানুষ বিগত দিনগুলোতে সিপিএমের সন্ত্রাসের বি(দ্ধে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমাদের দেখেছেন। উন্নততর বামফ্রন্টের যে নমুনা আপনারা দেখেছেন তার বি(দ্ধে উন্নততর বাংলা, উন্নততর সমাজ ও উন্নততর মানুষ তৈরি করতে সিপিএমের বি(দ্ধে একমাত্র প্রধানতম 'বিকল্প' যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই **তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে 'ঘাসের ওপর জোড়া ফুল' চিহ্নে(ভোট দিয়ে সন্ত্রাসমুক্ত(সকাল নিয়ে আসুন – আনুন পরিবর্তনের ভোর – আপনার আমার প্রিয় বাংলায়। 'উন্নয়ন-প্রগতি-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপে(তা' হোক আমাদের ব্রত। আমাদের মন্ত্র হোক 'সকলের পেটে ভাত, সকলের জন্য কাজ'। শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক মানবিকতা। জয় হোক মা-মাটি-মানুষের।**

আগামী লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবাংলায় তিনটি পর্যায়ে হতে চলেছে—৩০ এপ্রিল, ৭ মে ও ১৩ মে। উত্তরবঙ্গে হবে ৩০ এপ্রিল আর দ(ণবঙ্গে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-হাওড়া-হুগলি-নদীয়া-মেদিনীপুর-পু(লিয়াতে ৭ মে ও দ(ণ ২৪ পরগণা-উত্তর ২৪ পরগণা ও কলকাতায় নির্বাচন হবে ১৩ মে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার মা-মাটি মানুষ নতুন করে জোট বাঁধতে শু(করেছে। একদিকে মা-মাটি মানুষের জোট পরিবর্তনের ঊষার আলোকে ত্বরান্বিত করতে চাইছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সর্বতোভাবে দেউলিয়া সিপিএম সরকার মান-সম্মান খুইয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে ৩২ বছরের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসকে হজম করে নির্বাচনী হজমোলা নিয়ে আবার সেই পুরনো কাসুন্দি গাইতে শু(করেছে। এমনভাবে তারা কাসুন্দি গাইছেন যে নতুন কেউ, যে জানে না, হয়তো বা ভাববে, তবে কি বামফ্রন্ট সরকার ৩২ বছর বনবাদাড়ে ঘাসের (টি খেয়ে কষ্ট করছিল, আর তৃণমূল কংগ্রেসই কি ৩২ বছর (মতায় অর্থাৎ সরকারে ছিল! তাই কি তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বি(দ্ধে এইসব প্রচার করছে!

সমাজে নির্লজ্জ কিছু জন থাকে, যাদের না আছে লজ্জা আর না আছে ভয়। যারা রাজারহাটের হাজার হাজার একর কৃষিজমি লুটেপুটে খেয়ে গরীব অসহায় মানুষগুলোকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করে টাকার পাহাড় বানিয়েছে, তারা নাকি আবার আজ সিপিএম দলের অপপ্রচারের দায়িত্বে!

দেখলে মনে হয় ঘোড়াও হাসবে! জানি না, তা এইসব দুর্নীতিবাজ ভুঁইফোড় নেতারা দেখছেন কিনা! অনেকের মুখ থেকে অনেক সময় শোনার সুযোগ হয়েছে যে এই সব সিপিএমের তাত্ত্বিক নেতারা তাদের গ্রামের কেন্দ্রে পকেট থেকে লোক দেখানো কয়েকটা বিড়ি বের করে নাকি টান দেন! যাতে গরিব মানুষের চোখে একটা করে মিথ্যার আর ধোঁকার ঠুলি পরিয়ে রাখা যায়!

বাংলায় যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল না, তখন ছিল বিধান চন্দ্র রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেনের সরকার। এমনকি যার বি(দ্ধে সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার ছিল সেই সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলেও যা কাজ হয়েছে তার কোনও অংশ কি আজ সিপিএম দল তার কাজের (ত্রে তুলনা করতে পারে! ৭২ থেকে ৭৭ দেখিয়ে সিপিএম-এর কেটে গেল ৩২ বছর। হঠাৎ করে এখন সূর্যোদয়ের শিল্পায়নের ভাঁওতা। ''বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'' — এতো আমাদের বাংলার ঘরে ঘরে সবাই উচ্চারণ করতেন। তবে আজ কেন বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী এতো বিষণ্ণমনা!

বাংলার তো সব কিছু ছিল। ছিল ঘরে ঘরে আলপনা দেওয়ার আঙ্গিনা, মুক্ত(আকাশ, শ্যামল পল্লীবিথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, পরস্পরের প্রতি প্রীতি। আজ ''বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী''-র লক্ষ্মী কেন আমাদের ছেড়ে গেলেন! কেন আজ সবকিছু থেকেও কিছুই নেই? কেন আমরা স্বখাত সলিলে ডুবলাম!

বাংলার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্যাম শস্য(ত্র ও গোচারণ ভূমিতে চাষি সারাদিন পরিশ্রম করার পরেও ঘর্মাক্ত(কলেবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলা ঘরে মেঠো সুরে প্রাণের গান গাইতে গাইতে ফিরে আসতো। এখন ঘরের সন্ধ্যাদীপ অনেকাংশে অনাহারে ও দারিদ্রে শুকিয়ে গেছে। পেটের দায়ে হালের গ(বিক্রি(করেছে কৃষক। জলাশয় হয়ে গেছে প্রোমোটিং-এর বলি। বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে আর্সেনিক জল। চিকিৎসার পরিবর্তে শ্মশান অথবা কবর যাত্রা। কাজের পরিবর্তে চুক্তি(তে নিয়োগ! যুবক-যুবতীদের মুখের হাসি ফুরিয়ে গেছে সিপিএমী চুক্তি(র জাঁতাকলে। পড়াশুনোর চাপে শিশুমনগুলি হয়েছে অতি(দ্র মানুষের পরিণত সংস্করণে।

কোথায় সেই পাটশিল্প? চা শিল্প? ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প? মাঝারি শিল্প বা গৃহ শিল্প? টেক্সটাইল শিল্পগুলো কোথায় আজ! শিল্পর থেকে আজ শুঁড়িখানা অনেক বেশি। শিল্প মানে কেন শুধু মদের বন্যা! আর বিষমদে মৃত্যুর কান্না! কেন এসব ভাববো না আমরা! কেন বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে ল(ল(জন বাংলার বাইরে! কেউ বা দিল্লিতে, কেউ বা মুম্বাইতে, কেউ বা রাজস্থানে, কেউ বা ইউপি বা বিহারে। টাটাবাবুদের জন্য সব ছাড়! আর বাংলার অন্য শিল্পবন্ধুরা? তাদের দিতে হয় পঞ্চাশ রকম ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি। নন্দরাম মার্কেটের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পিটিটিআই-এর ৭৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী বামফ্রন্ট সরকারের প্রতারণার শিকার। প্যারা টিচাররা সবথেকে কম মাইনে পায়। ডানলপ থেকে বসুমতী সব বন্ধ। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অর্ধেক। শি(ক-শি(কারা রিটায়ার করার পরে পেনশন না পেয়ে পথ চেয়ে বসে থাকেন। পুলিশ কর্মচারীদের ফিফথ কমিশনের রেকমেন্ডেশন এখনও ইমপি-মেন্ট করা হয়নি। বেতন বৈষম্য সর্বত্র। রেশন বন্ধ। ২৪ ঘন্টায় ২০ ঘন্টার ডিউটি । — সব মিলিয়ে এতো এক অমানবিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সরকারি জুলুমের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, পুলিশবন্ধুরাও তাদের প্রতিবাদ জানাতে পারেন না। মা-বোনেদের মর্যাদা আজ একেবারে ভূলুণ্ঠিত। নারীপাচারেও বাংলা শীর্ষে। অনাহারে বাংলা প্রথম। বেকারিতে বাংলা প্রথম। সংখ্যালঘুদের জীবনজীবিকার কোনও নিরাপত্তা নেই। তপশিলী আদিবাসী ও ওবিসিদের সংর(ণ থাকলেও তাদের সময়মতো সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। এছাড়াও আরও অনেক অনেক বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-অত্যাচার ও অবিচারের কারাগারে বন্দি বাংলার গণতন্ত্র ও মানবিকতা।

ভোটার লিস্ট থেকে ভোটে কারচুপি, রিগিং মেশিনারি সব নির্লজ্জ জায়গায় পৌঁছেছে। ৩২ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে ও শোষণে অত্যাচারের যে দহন জ্বালায় বাংলায় অন্যায়ের চিতাভস্ম জ্বলছে সেই শ্মশান ভস্মের ওপরই যদি উন্নয়নের উদ্যম যজ্ঞ তৈরি করতে হয় তবে আগে আমাদের সবাইকে সমস্বরে বলতে হবে, আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও, যা আমাদের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জীবনধারণের অধিকার, কাজের অধিকার। এসো ভাই হিন্দু, এগিয়ে এসে বলো পরিবর্তন চাই। এসো মুসলিম ভাই-বোন, এগিয়ে এসে বলো আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও। আমরাও পরিবর্তন চাই। বলো বলো ভাই-বোনেরা — বলো হিন্দু, বলো মুসলমান, বলো শিখ, বলো খ্রীষ্টান, বলো বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক — সব বঙ্গবাসী উদাত্ত কণ্ঠে এগিয়ে এসে বলো অনেক হয়েছে, আর নয়, বদল চাই, বদল, এবার বদল আসবে বাংলায়। ফিরিয়ে দাও নবজাগরণ, ফিরিয়ে দাও নতুন ভোর। পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্তন চাই। উন্নয়ন, উন্নয়ন, উন্নয়ন চাই। বাংলার মা-মাটি-মানুষ বাংলার স্বার্থে নিজেদের মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচার স্বার্থে জোট বাঁধুন। পরিবর্তন আনুন। জয়ী হোক গণতন্ত্র, জয়ী হোক মানুষ।

তাই এই রাজ্যের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে আসন সমঝোতা'র ভিত্তিতে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট বিরোধী ঐক্যও গড়ে উঠেছে। তাকে মর্যাদা দিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেস ২৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জয়নগর কেন্দ্রের আসনটি তৃণমূল কংগ্রেস এসইউসি দলের প্রার্থীকে ছেড়ে দিয়েছে। বাদবাকি ১৪টি আসনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীরা লড়াই করবেন।

আমাদের আবেদন, সিপিএম তথা বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পরাজিত করতে ২৭টি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও জয়নগর কেন্দ্রে এস ইউ সি প্রার্থীকে এবং বাদবাকি ১৪টি আসনে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত(করে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পরাজিত ক(ন।

জয়হিন্দ | জয় হে বন্দেমাতরম | জয়তু বাংলা খোদা হাফেজ

১৪ মার্চ ২০০৯
কলকাতা

(মমতা ব্যানার্জী)
সভানেত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

- দীঘা কেন গোয়া হবে না?
- উত্তরবঙ্গকে কেন এশিয়ার 'সুইজারল্যান্ড' করা যাবে না?
- কলকাতা কেন লন্ডনের সমক(হয়ে উঠবে না?
- সমুদ্র-নদী-অরণ্য-পাহাড় ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরে কেন অর্থনৈতিক ভান্ডার গড়ে তোলা যাবে না?

সবই সম্ভব – যদি যথাযথ কর্মসূচি নিয়ে তাকে বাস্তবে কাজে রূপান্তরিত করা হয়!

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ও আমাদের ভূমিকা

ভারতীয় জনগণকে আবার নতুন কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করার জন্য ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রে পাঁচ বছর ইউপিএ সরকার (মতায় থাকার পর পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে এনডিএ সরকার সাড়ে চার বছর (মতায় ছিল। প্রকৃতপ(১৯৯৬ সাল থেকেই দেশের কেন্দ্রে কোয়ালিশন যুগ চলছে। দেশের স্বাধীনতার ৬২ বছর পরে, সংবিধান চালু হবার ৫৯ বছর পরে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ১১টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেশের আমজনতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক শোষণ বন্ধ করা যায়নি। আমরা সংবিধানে প্রতিশ্রুত ন্যায় ও সাম্য মানুষকে দিতে পারিনি। স্বাধীনতার পরে দেশ অনেক (ে ত্রে এগিয়েছে, বিজ্ঞান গবেষণায় চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু অর্ধেকের বেশি দেশবাসী এই অগ্রগতি ও উন্নয়নের শরিক হতে পারেননি। ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাহারে ও অর্ধাহরে দিন কাটান। পশ্চিমবঙ্গে আমরা জানি পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোলে আদিবাসীদের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা বা মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে গঙ্গার ভাঙ্গনে (তিগ্রস্ত মানুষের অনাহারে মৃত্যুর কথা। ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে (মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে) ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা ব্যাপকভাবে আত্মহত্যা করেছেন। আমাদের (ে-াগান তাই 'সবার পেটে ভাত, সবার জন্য কাজ'। আমাদের মন্ত্র 'গণতান্ত্রিক পথে উন্নয়ন'। যার অভিমুখ থাকবে দরিদ্রের জীবনের মান উন্নত করার দিকে। ১৯৯১ সাল থেকে সব কেন্দ্রীয় সরকারই বি(্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতি নিয়ে চলেছেন। তাতে দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ উপে(ত হয়েছে। আমরা বি(্বায়নের বি(দ্ধে নই, যদি তা গরিব মানুষের কাজে লাগে। সব মানুষের যাতে ভালো হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।

অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি -- সর্বত্রই এক অরাজক অবস্থা চলছে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের অর্থনীতি নিদা(ণভাবে অব(দ্ধ। বেকারি ও দারিদ্র ত্র(মবর্ধমান। ৩২ বছরের বামফ্রন্ট, প্রকৃত অর্থে সিপিআই(এম)-এর একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে এরাজ্যে গণতন্ত্রের সলিল সমাধি ঘটেছে। সভ্য সমাজের রীতি-নীতি-সংস্কৃতির স্থান নিয়েছে অসভ্য-বর্বরতা ও পেশীশক্তি(র আস্ফালন।

সিপিআই(এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট-এর অপশাসনে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ, দলিত, সংখ্যালঘু সমাজ, তপশিলী জাতি, আদিবাসী মানুষ সহ সমস্ত অনুন্নত পশ্চাদপদ মানুষের নাভি(্বাস অবস্থা। চরমভাবে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ। এক কথায় চলমান অপশাসনে অতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত মানুষ সহ সমাজের সব স্তরের মানুষ। এই অবস্থা থেকে মানুষ উদ্ধার পেতে চায়। চায় বিকল্প কিছু গড়ে উঠুক। নিদেনপ(সরকারটা বদলাক।

পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী 'শিল্পায়ন' ও 'উন্নয়ন' নীতির বি(দ্ধে বিগত বছরগুলিতে ব্যাপক গণআন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম - বলপূর্বক বহু ফসলি কৃষিজমি দখলের সরকারি অভিযানের বি(দ্ধে কৃষক সমাজ সহ অন্যান্য অংশের মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আন্দোলন সংঘবদ্ধ হয়েছে আন্দোলনকারীদের উপর রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের বি(দ্ধে। আন্দোলন গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ভয়াবহ আত্র(মণের বি(দ্ধে। সিঙ্গুরে আন্দোলন দমনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙিঘত

হয়েছে যথেচ্ছভাবে। নন্দীগ্রামে ঘটেছে একের পর এক গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটনা। গণদাবি উপে(া করে বলপূর্বক সিঙ্গুরে জোর করে উর্বর কৃষিজমি দখল করা হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন' এবং ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন বাতিলের দাবি। খুচরো বিপণনে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশের বি(দ্ধে, রেশন কেলেঙ্কারি ও রিজওয়ানুর কাণ্ডের বি(দ্ধে সোচ্চার হয়েছেন মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ সহ নানা আশু দাবি উঠে এসেছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম)-এর চরম অপশাসন থেকে আজ রাজ্যের মানুষ মুক্তি(পেতে চাইছেন। মানুষের এই আশা-আকাঙ্খার প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়েই বামফ্রন্টের একটি রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অপরিসীম গু(ত্ব অর্জন করেছে।

তিন দশক ধরে একটানা রাজ্যের শাসন (মতায় থাকার কারণে সিপিআই(এম) ও তার পরিচালিত সরকার নিদা(ণ উদ্ধত ও (মতাদম্ভী হয়ে পড়েছে। (মতা ছাড়ার কথা তারা ভাবতেই পারে না। এদের একচ্ছত্র শাসনের অধীনে রাজ্যে গণতন্ত্র পর্যুদস্ত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভয়ঙ্করভাবে দলতন্ত্রের শিকার। দলতন্ত্রের সর্বগ্রাসী আঘাতে পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ নাগরিক জীবন ও সামাজিক জীবন বিপন্ন। সমাজের সর্বস্তরের দলীয় সিদ্ধান্তকে সরকারি ছাপ মেরে সভ্য সমাজের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি - মূল্যবোধ ও জনগণের সাংবিধানিক অধিকারগুলিকে পর্যুদস্ত করে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন মেনে নিতে এরা বাধ্য করেছে রাজ্যের মানুষকে। এরা ঘোষিত মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে বিচ্যুত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত অধঃপতিত হয়েছে। নেতৃত্বের প্রতাপে কোণঠাসা হয়েছেন সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মীরা। প্রকৃত বামপন্থীরা তাই সিপিআই(এম) দলকে আর 'বাম' দল বলে মনে করছে না। বামফ্রন্টের অন্য শরিকরাও প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বাম আদর্শের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের বিপুল অংশ।

সিপিআই(এম)-এর একচেটিয়া শাসনে সরকার ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে গভীর দুর্নীতি। গরিব মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতি ধরা পড়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থা, অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনা, ইন্দিরা আবাসন, বিপিএল কার্ড, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বর্তমানে দুর্নীতির কবলে। শি(া, স্বাস্থ্য সহ সরকারি কাজকর্মের বিভিন্ন (ে ত্র চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই জমানায় যোগ্যতার মর্যাদা নেই। দলের আনুগত্যই শেষ কথা। তাই শি(াজগতও সর্বগ্রাসী দলতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দলতন্ত্রের শিকার হয়েছে। সরকারি ও দলীয় চোখ-রাঙানির দ্বারা সাংস্কৃতিক জগতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের হরণ করা হয়েছে বারবার। খেলাধূলার অধঃপতন ঘটেছে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার অভাবে।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াই পশ্চিমবঙ্গকে ৩২ বছর ধরে চলা 'অন্ধকারের দুঃশাসন ও সার্বিক অধোগতি' থেকে মুক্ত(করে সর্বস্তরে নাগরিক সমাজকে প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদন দেওয়ার বৃহত্তর সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমে সত্রি(য় সমর্থন আদায় ও সর্বত্র সিপিআই(এম)-এর মুখোশ খুলে দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান ল(্য।

হাজার হাজার মানুষের অসহায় আর্তনাদ বাংলার গ্রামের আকাশ বাতাস আজ ভারি হয়ে উঠেছে। আসলে এই রাজ্যে কোনও সরকার আছে কি নেই তাই আজ রাজ্যের মানুষের এক নম্বর প্র(। সিপিআই(এম)-এর জমানায় সাড়ে আট কোটি মানুষের সামনে এই হল পশ্চিমবাংলার বাস্তব জীবন চিত্র।

বামফ্রন্ট জমানায় কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সিপিআই(এম)-এর জহ্লাদদের আত্র(মণে নিহত হয়েছেন, বহু কর্মী আহত হয়েছেন ও কয়েক হাজার কর্মী ঘরছাড়া হয়েছেন, যাদের বেশির ভাগ আজও ঘরে ফিরতে পারেননি। সমস্ত কর্মীকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার প্র(ে তৃণমূল কংগ্রেস আজ অঙ্গীকারবদ্ধ।

আজ পশ্চিমবাংলার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন আর্থিক সমৃদ্ধি, বিভিন্ন (ে ত্রে উন্নয়ন, বেকারি দূর করার ল(্যে যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান, শি(া, স্বাস্থ্য, পরিবহন, শিল্প ও কৃষি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পরিষেবার উন্নতি ও সম্প্রসারণ ও মানুষের কল্যাণে দুর্নীতিমুক্ত(উদার পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, আর সবার ওপরে সম্প্রদায় ও দলমতনির্বিশেষে সকল অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কর্মের জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো একমাত্র ল(্য। হিংসা, রক্ত(পাত ও ধ্বংস যজ্ঞের হোতা সিপিএম দল ও তাদের বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু এসবের ধারে কাছে নেই।

তৃণমূল কংগ্রেস বি(্বাস করে আপোষহীন সংগ্রামে। ডাক দেয় সংগ্রামী মানুষদের একত্রিত হতে, সংহত হতে, সংঘবদ্ধ হতে এবং নির্ভীক হতে। মর্যাদা আসে উপযুক্ত(ভাবে প্রাপ্য অধিকার দাবি করলে। দুর্বলকে ক(ণা করা যায়। সবল না হলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া যায় না। কৃপা ও ক(ণা ভি(া করলে দেশের ও জাতির কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।

মানুষের বিপদে, তার দুঃখ দুর্দশা ও অপমানের বি(দ্ধে যে কোনও সংগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস হবে বিপন্ন মানুষের নিত্য ও সহযাত্রী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ছোট বড়, উঁচু-নীচু সমস্ত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবাংলার কাছে তৃণমূলের এই হল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার। তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত অপশাসন ও দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে সৃজনশীল ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে পশ্চিমবাংলাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃণমূল কংগ্রেসের মূল লড়াই সিপিএমের বি(দ্ধে। সিপিএমের বি(দ্ধে লড়তে এ রাজ্যে যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে আমরা তাদের সঙ্গে থাকব।

তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের অধিকার ও তৃণমূল স্তরে মহিলাদের (মতা প্রদানের (ে ত্রে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংর(ণের সিদ্ধান্তকে দল কার্যকরী করেছে। দল মহিলাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (মতা প্রদানের ল(্যে কাজ করে যাবে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে 'যুদ্ধং-দেহি' মনোভাবের পরিবর্তে সহমর্মিতার ও সহযোগিতার মনোভাব মৈত্রীর সম্পর্ক অটুট রাখতে তৃণমূল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্প্রতি মুম্বইতে সন্ত্রাসবাদীরা যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালিয়েছে, তা সমস্ত দেশবাসীকে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। এর আগেও ২০০৮ সালে সন্ত্রাসবাদীরা দেশের কয়েকটি বড় শহরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ও তৃণমূল কংগ্রেস

এরাজ্যে মানুষের সামনে প্রধান বিপদ সিপিএম। তাই আমাদের মূল ল(্য পশ্চিমবাংলা থেকে তাদের (মতাচ্যুত করা। সারা বাংলার মানুষ, এমনকি সিপিএম-এর বহু শরিকদলের সদস্যরাও বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমাদের দলে আসছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার উন্নয়নের জন্য সিপিএম-এর বি(দ্ধে সর্বাত্মক লড়াই-এ সামিল হয়েছে।

এই মূল নীতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের ৩২ বছরের অধোগতির অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে সিপিএম-কে সর্বত্র জনবিচ্ছিন্ন করার ল(্যে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। তিরিশের দশকে এই রকমই এক ত্র(ান্তিকালে ভবিষ্যতের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন --

'দাসত্ব, তা সে সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক যাই হোক, মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, নানা প্রকারের অসাম্যের সৃষ্টি করে। অতএব সাম্য সুনিশ্চিত করতে, সমস্ত রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব দূর করতে হবে, আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে, সর্বাংশে স্বাধীন হতে হবে।'' **দানবীয় ক্যাডাররাজের দাসত্ব থেকে বঙ্গবাসীকে মুক্তি(দেওয়াই তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি ও ল(্য।** ভারতের অন্যতম প্রধান অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যদি স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসন চলতেই থাকে, তাহলে ভারতে সার্বিক গণতন্ত্র থেকে যাবে অধরা। তাই মানবতার স্বার্থে ও গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রকৃত গণতন্ত্রে বি(্বাসী সকল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি(কে তৃণমূল কংগ্রেস আহ্বান জানাচ্ছে পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ল(্যে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই সর্বাত্মক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য।

কেন্দ্রে এমন একটি সরকার স্থাপন করা যা হবে স্থায়ী, গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপে(। পাশাপাশি কেন্দ্রে দরকার এমন একটি সরকার যারা পশ্চিমবাংলাকে সাহায্য করবে। বাংলার উন্নয়নের কথা ভাববে। পশ্চিমবাংলার স্বার্থে লড়াইকে মদত দেবে।

বামফ্রন্টের অপশাসনের অবসান ঘটাতে প্রকৃত বিকল্প শক্তি(কে সাহায্য করবে ও বাংলায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কায়েম করবে। দিল্লির নির্বাচনে তাই আমাদের ল(্য ---

- **স্থায়ী সরকার, সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী।**
- **গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপে(, প্রগতিশীল সরকার।**

আমাদের সতর্ক ল(্য রাখতে হবে সিপিএম যেন বেশি আসন না পায়। ওদের আসন যথাসম্ভব কমাতে হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া কিছু আসনের ওপরে ভিত্তি করে দিল্লিতে করে সিপিএম। এটা এবার বন্ধ করতেই হব। বিনম্রতার সাথে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের দলের বাংলা থেকে আসন বৃদ্ধি বাংলার মানুষের কাছে আরও সুযোগ করে দেবে কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলার উন্নয়নে আরও বেশি গু(ত্ব, আরও বেশি কাজ আদায় করার। এই রাজ্যে সিপিএমের জয়ে বাংলার কোনও লাভ হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করেছে বিগত জোট সরকারের অংশ নিয়ে মাত্র এক বছর পাঁচ মাস সময়কালে রেল দপ্তর থেকে বাংলার জন্য ঘটেচে এক অভূতপূর্ব 'রেল বিপ-ব'।

আর এই প্রসঙ্গে এসে পরে পশ্চিমবাংলার বর্তমান বেহাল অবস্থার আলোচনা। শি(া, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, আইন-শৃঙ্খলা সহ সব ে ত্রেই ডুবেছে পশ্চিমবঙ্গ। ডুবিয়েছে সিপিএম। সন্ত্রাস, বৈজ্ঞানিক রিগিং করে ওরা (মতায় টিকে আছে।

গ্রাম বাংলায় চলছে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ভোট-জালিয়াতি। প্রতিবাদ করলেই খুন। পুলিশ নীরব দর্শক। বিভিন্ন খাতে আসা কেন্দ্রের টাকা লুঠ হচ্ছে। চলে যাচ্ছে অন্য খাতে। ক্যাডার আর পার্টি কার্ড হোল্ডার সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে নির্বাচন।

সিপিএম নেতৃত্বে বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ আজ ঘোর অরাজকতায় নিমজ্জিত। এরাজ্যে কোনও আইনের শাসন নেই, আইন র(াকারী যে সরকার, সেই রাজ্য সরকারই আজ প্রতিটি ে ত্রে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। ১৯৭৭ সাল থেকে রাজ্যের কোষাগার লুণ্ঠনের কাজ শু(হয়। সিপিএম দল তার দলীয় তহবিল স্ফীত করার জন্য এবং দলীয় নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তি(গত সম্পত্তি বানাবার তাগিদে রাজ্যের তহবিলকে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করছে, উন্নয়ন ও পরিষেবার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থকে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যবহার করে এসেছে এবং সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপির মাধ্যমে বছরের পর বছর জনসাধারণের কাছে এসব তথ্য লুকিয়ে রেখে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এসেছে। এ রাজ্যে কৃষক তার ফসলের উচিত মূল্য পায় না, জলের দরে ফসল বিক্রি(করতে বাধ্য হয়। তথাকথিত রাজ্য সরকার নির্লিপ্ত, অমনোযোগী। সরকার নিজেই ঋণের দায়ে দেউলিয়া, মোট ১.৫৩ ল(কোটি টাকা যা এখন প্রায় ২ ল(কোটি টাকা ছুঁয়েছে। সিপিএম পাড়ায় পাড়ায় প্রাসাদোপম অট্টালিকা বানিয়েছে, বর্তমানে রাজ্য সরকারের আয় বাড়াবার জন্য একের পর এক করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারের কর সব থেকে বেশি। শিল্প(ত্রের অবস্থা দিন দিন ত্র(মশ শোচনীয় হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ে ত্রের শিল্পসংস্থাগুলি লাগাতার লোকসান দিতে দিতে মৃতপ্রায়। মুখ্যমন্ত্রী বছরের পর বছর শিল্প পুন(জ্জীবনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। রাজ্যের শিল্প(ত্র ধ্বংস প্রায়। সরকার শ্রমিক ও কৃষক মারার যজ্ঞে সামিল হয়েছে। বিদ্যুতের ে ত্রে আকাশ ছোঁয়া মাসুল বৃদ্ধি ঘটিয়েছে এই সরকার। রাজ্যে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ। ডানলপ কারখানাকে সমস্ত কর্মী নিয়ে চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বসুমতী কর্পোরেশনকে চালু রাখার ব্যবস্থা আগে ক(ক সরকার। বর্তমান সিপিএম সরকারের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বর্গী আমলের অরাজকতাকে স্মরণ করাচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ। এরাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসনকে কব্জায় আনার ফলে আজ শাসক সিপিএম, পুলিশের একাংশ ও গুণ্ডাদের এক অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছে। ভেড়ি লুঠ, জমি দখল, জলাভূমি ভরাট, জঙ্গলের কাঠ চুরি, তোলাবাজি, মাদক ব্যবসা, নারী পাচার, অস্ত্রব্যবসা, সীমান্তে চোরাচালান, নদীব(র বেআইনি বালি তোলা থেকে শু(করে সব রকম অন্যায় ও বেআইনি কাজের সঙ্গে এই চত্র(যুক্ত(। সারা রাজ্যে চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপকর্ম দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের জান-মান সম্পত্তির কোনও সুর(া নেই। রাজ্য জুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্য, শি(া সহ সমস্ত পরিষেবা সিপিএম ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। স্বাস্থকেন্দ্র ও সরকারি হাসপাতালগুলি এক জীবন্ত যমালয়। একের পর এক শিশু মৃত্যু, হাসপাতালে চিকিৎসার অবহেলাজনিত মৃত্যু, হাসপাতালগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি এবং বিদেশি সহায়তার অর্থ অপচয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অরাজক করে তুলেছে।

শি(া-সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানে সংখ্যালঘুদের যথাযথ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজ্যের অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান পংক্তি(তে নিয়ে আসতে

হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সিপিএম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে শুধু ভোটার হিসাবে চিহ্নি(ত করেছে, মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয়নি। তার প্রমাণ সাচার কমিটির রিপোর্ট। বর্তমানেও সিপিএম সরকার সংখ্যালঘুদের শি(া প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন করে বিধি নিষেধ আরোপ করতে উদ্যত। মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের ন্যায্য দাবি আলিয়া মাদ্রাসা বি(বিদ্যালয়ের নামকরণকে পূর্ণ সমর্থন জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।

সংখ্যালঘুদের না আছে জীবনের নিরাপত্তা, না আছে উন্নয়ন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও তাদের কর্মসংস্থান সব ব্যাপারে তাদের উপযুক্ত(সম্মান জানাতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সিপিএম রাজত্বে তপশিলী, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের হয়রানির অন্ত নেই। এদের শংসাপত্র পেতেও প্রচুর হয়রানি সহ্য করতে হয়। তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় সাহায্যের অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যখাতে ব্যয় করে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে বঞ্চিত করছে।

সরকার অনিচ্ছুক কৃষকদের জমির জোর করে কেড়ে নিয়ে শিল্পায়নের নামে এক শ্রেণীর পুঁজিপতি মুনাফাদের তাঁবেদার সরকারে পর্যবসিত হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সিপিএম হার্মাদ বাহিনী ও পুলিশের যৌথ আত্র(মণে নিহত হয়েছে অনেক মানুষ। অথচ সেখানে আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। নিজেদের শরিকদল ও এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে দিনহাটায়, বাসন্তীতে। আমরাও শিল্পায়ন চাই। চাই কৃষি ও শিল্পের সুসম বিকাশ। কিন্তু কৃষক ও মজুরদের রক্তে(র ওপর দাঁড়িয়ে নয়। শিল্পায়ন হোক অনুর্বর জমিতে।

সিপিএম সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতায় ধনে-প্রাণে বাংলার মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটা মূহূর্তে। গ্রামে গঞ্জে ''বার্ড ফ্লু'-র মতো শহরেও মানুষের জীবনের সাথে অর্থনৈতিক ''ফ্লু'' মানুষের অর্থনীতিতেও ধ্বস নামিয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে ''বার্ড ফ্লু''র নামে ধনে-মানে-প্রাণে মানুষকে শেষ করে দেবার পালার বি(দ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। ব্লকে ব্লকে ভেটেনারি চিকিৎসক ও তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাখার প্রয়োজন ছিল তার কিছুই সারা বাংলায় নেই, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের ওপর যে ধরণের পাশবিক অত্যাচার ও রাজ্যে হয় তা কোনও সভ্যসমাজে হয় না। শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এ রাজ্যে খুন হয়েছেন। ৩০ হাজার কর্মীর জমি ঘরবাড়ি লুঠ হয়েছে। কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আজও ঘরছাড়া। **রাজনৈতিক কর্মীদের নামে সাজানো মামলা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি(র ব্যবস্থা নিতে হবে।**

পশ্চিমবঙ্গে বি(বিদ্যালয় শি(া ভারতের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছে। প্রথামিক থেকে বি(বিদ্যালয় অবধি শি(া ব্যবস্থার নির্লজ্জ রাজনীতিকরণের ফলে শি(া (ে ত্রে একদা অগ্রণী এই রাজ্যের আজ এমন দৈন্যদশা। কারিগরী শি(া নিয়ে রাজ্য সরকার ধাপ্পাবাজি করেছে। তাই এবছর ইঞ্জিনিয়ারিং-এরাজ্যে বহু আসন খালি রয়েছে অথচ এ রাজ্যের ছাত্ররা উচ্চশি(ার জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। **শি(া সম্প্রসারণ ও শি(া(ে ত্রে সিপিএমের রাজনৈতিক হস্ত(েপ রদের এবং পিটিটিআই ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে।**

পশ্চিমবঙ্গ ও তৃণমূলকংগ্রেস

রাজ্য সরকার মুখে শিল্পায়নের কথা বললেও বামফ্রন্ট সরকার নতুন শিল্প স্থাপনে ব্যর্থ। এর ওপর ডানলপ কারখানা নতুন করে বন্ধ হয়েছে। রাজ্যের যুব সমাজের কোনও ভবিষ্যৎ চিত্র রাজ্য সরকার রাখতে পারেনি। বন্ধ কারখানা খোলা ও (গ্ন কারখানা সচল করার কোনও দায়িত্বই সরকার নেয়নি। ভোটের মুখে তৃণমূলের নেতৃত্বে ডানলপ কারখানা খোলার দাবি এতই জোরদার যে কর্তৃপ(ডানলপে র(ণাবে(ণের কর্মীদের কাজে যোগ দিতে বলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস চায় ত্রিপা(ি ক চুক্তি(র মাধ্যমে ডানলপ কারখানার উৎপাদন চালু সহ শ্রমিক স্বার্থ র(া করে সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে কারখানার দরজা পুরোদস্তুর খোলার ব্যবস্থা করতে।

রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা সম্প্রতি কলকাতার অটো সমস্যা নিয়েও ধরা পড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না করেই তারা টু-স্ট্রোক অটো বন্ধ করার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার জন্যই শহরে অশান্তি হয়েছে। পরিবেশকে র(া করা আমাদের সকলের কর্তব্য। ঠিক যেমন কতর্ব্য খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থও র(া করা। অন্যদিকে পুলিশের ব্যর্থতায় শহরে বিষ মদে ৩৮ জন মানুষের প্রাণ গিয়েছে।

বর্তমানে সারা **পৃথিবী অর্থনৈতিক মন্দায় আত্র(ান্ত।** ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে না। উৎপাদন শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি(র শিল্প উভয়ই মন্দায় আত্র(ান্ত। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে আগামী কয়েক বছর দেশকে কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

এই পরিপ্রে(িতে নির্বাচন কমিশনে বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। **এই রাজ্যে যেহেতু সরকার প্রশাসনকে কব্জা করে রেখেছে সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গকে ব্যতিত্র(মী রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করে এখানে ইভিএম মেশিনের বদলে ব্যালটে ভোটের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা অবিলম্বে ত্রুটিমুক্ত(করে এই রাজ্যের প্রকৃত ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার র(ার দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।**

চাই মানুষমুখী নীতি – চাই সকলের জন্য উন্নয়ন

রাজ্যের উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সেই প্রসঙ্গে সরকারের ঠিক কী ভূমিকা, এই বিষয়ে স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত জ(রি। একথা আজ সকলেই বুঝে গেছেন যে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো, ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আছে কিছু মুখস্থ করা চটকদারি কথা আউড়ে যাওয়া — তথ্যপ্রযুক্তি(, জৈব প্রযুক্তি(, খাদ্য-প্রক্রি(য়াকরণ ইত্যাদির কথা। আদতে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন আর শিল্পায়নের নামে করে চলেছেন কেবল কিছু ফ্লাই-ওভার, শপিং মল, আর বেসরকারি উপনগরী স্থাপনের চেষ্টা, যার মূল ল(্য বিশেষ শ্রেণীর শহুরে স্বাচ্ছন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সংস্কৃতি-মনস্ক বলে আখ্যা দেয় কিছু পেটোয়া বুদ্ধিজীবি ও সংবাদপত্র। কারণ, তিনি নাকি সর্বদাই, সর্বত্র কবিতা আউড়ে থাকেন। এমনকি আমলাশোল, জলঙ্গী থেকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান, দ(িণবঙ্গের জুট মিলে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও তাকে এই প্রবৃত্তি থেকে বিরত করতে পারেনি। তিনি অশ্রুজল ত্যাগ করে বলেন দারিদ্রের জ্বালায় রাজ্যে মেয়েরা

বিপথগামী হচ্ছে। বলেন না, কেন তাদের ৩২ বছর রাজ্যশাসনের পরেও এমনটা ঘটেছে, কোন 'উন্নয়নের' খেসারত দিচ্ছে রাজ্যের মানুষ?

বি⁄ায়নের ফলে উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রে(িত, এবং তার সমস্যা ও সম্ভাবনার বড় রকম পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই কারণে উন্নয়ন সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্ট করার পাশাপাশি উন্নয়নের অভিমুখকেও স্থির করা জ(রি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের উন্নয়নের অভিমুখ আছে কেবল কোনও মতে দেশি-বিদেশি ফাটকা পুঁজিকে ডেকে এনে উন্নয়নের নামে জমি পাইয়ে দেওয়া, প্রতিষ্ঠা করা শুধুই শহুরে স্বাচ্ছন্দের উপনগরী। এই কাজে তারা হাজার হাজার একর জমি থেকে কৃষক ও বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করতেও বিব্রত বোধ করেন না। এদের উন্নয়নের অভিমুখে নেই কোনও স্পষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা— শিল্প, কৃষি, পরিষেবা ও অসংগঠিত (ে ত্র, স্বনিযুক্ত(পেশা, (ু দ্র ও মাঝারি ব্যবসা পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শি(া -- কোনও (ে ত্রেই রাজ্যের সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ কোনও নীতি নেই। রাজ্যের ত্র(মবর্ধমান সমস্যাগুলির সমাধানেরও কোনও প্রচেষ্টা নেই। বেড়ে চলেছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, (গ্রশিল্প, আঞ্চলিক ও গ্রাম-শহরের উন্নয়ন বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, অনগ্রসর ও তপশিলী জাতি, জনজাতি ও আদিবাসীর সমস্যা, জমির উর্বরতার (য়, নদীভাঙ্গন আর বন্যা। চিন্তাদর্শে সর্বস্বান্ত ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আছে শুধু অন্তঃসারশূন্য কিছু (ে াগান --'উন্নততর পশ্চিমবঙ্গ' আর 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' --- মার্কা কিছু ফালতু বাগাড়ম্বর।

এদিকে রাজ্যের ভয়াবহ সর্বাঙ্গীণ সংকট ও অন্যদিকে বি⁄ায়নের ফলে সৃষ্ট উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা, এই দুইয়ের প্রে(িতে রাজ্যের পুনর্গঠনের কাজে তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। বিভ্রান্ত, নীতিহীন ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার কোনও মতে বি⁄ায়নের এক চট-জলদি ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে শুধুই বি⁄পুঁজি আর বি⁄মানের ভোগ্যবস্তুকে দোরগোড়ায় এনে ফেলাকেই পরম কর্তব্য ঠাউরেছে। তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে বি⁄কে দোরগোড়ায় ডেকে আনা যেমন প্রয়োজন তেমনই আরও জ(রি স্থানীয় সম্পদ ও দ(তাকে সম্বল করে স্থানীয় অর্থব্যবস্থাকে মজবুত বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনমতো বি⁄ের দোরগোড়ায় যাওয়া। এই কাজটি সুসম্পন্ন হলে উদ্বাহু হয়ে ডাকতে হয় না, বি⁄ আপনি আসে দোরগোড়ায়। স্থানীয়করণের এই প্রয়োজনীয়তাকে বি⁄ায়নের প্রবক্ত(া বি⁄ ব্যাংকও অস্বীকার করেনি (ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৩)। এই প্রয়োজনীয়তা শুধু অজানা থেকে গেছে রাজ্যের ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী তাই স্থানীয় অর্থব্যবস্থা নয়, ব্যস্ত হয়েছেন কী করে জাপানি শিল্পপতিদের মন পেতে তাদের মনোরঞ্জনে সুন্দরবন অঞ্চলে আস্ত একটি দ্বীপ উপহার দেবেন -- 'আসুন, আপনারা গল্ফ খেলুন'।

রাজ্যের যথার্থ শিল্পায়নে বেসরকারি উদ্যোগের প্রতিও ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী দ্বিচারিতা করে চলেছেন। যথার্থ শিল্পোৎপাদনে ছোট বড় সব রকমের উৎপাদনশীল পুঁজির বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পরিবেশ গড়া নয়, এই সরকারের নজর কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নির্বিচার বেসরকারিকরণ ও বন্ধ কল-কারখানার জমি দেশি ও বিদেশি বৃহৎ প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার দিকে। বেসরকারিকরণ মানেই যে বেসরকারি উদ্যোগের সহায়তা নয় তার প্রমাণ মেলে এই রাজ্যেই। একটি বা দু'টি অতিবৃহৎ শিল্প নয়, বেসরকারি উদ্যোগের প্রাণ হল অসংখ্য (ু দ্র

ও মাঝারি শিল্পের স্রোত। বামফ্রন্টের অপশাসনে আর পার্টির নেতাদের মদতপুষ্ট তোলাবাজিতে অব(দ্ধ হতে হতে এই স্রোত শুকিয়ে গেছে এই রাজ্যে -- নেই পরিকাঠামো, পরিবেশ বা সরকারের কোনও সহায়ক ভূমিকা। তাই আজ সারা ভারতের (ু দ্র শিল্পের ⁄শান নামে পরিচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফলকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজেকে দেশের উন্নয়নের একজন ভাগীদার (stake holder) রূপে নিজেকে ভাবতে পারেন। সেই ল(্যে রচনা করতে হবে জাতীয় উন্নয়নের রূপরেখা।

রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ সংকট ও বি⁄ায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রে(িতে তৃণমূল কংগ্রেসকে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ---

- **উৎপাদনে রাজ্যের স্থানীয় দ(তা ও তুলনামূলক সুবিধার (ে ত্রগুলিকে চিহ্নি(ত করে শক্তিশালী করা।**
- **উৎপাদনের স্থানীয় প্রযুক্তি(জ্ঞান ও কর্মীদ(তার প্রয়োগ বাড়ানো।**
- **স্থানীয় উৎপাদনশীল ও পুঁজি বাজারব্যবস্থার বিকাশ।**
- **সামাজিক ও সরকারি উদ্যোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।**
- **সামাজিক (ে ত্রগুলির বিকাশকেই উন্নয়নে সরকারের মূল দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা।**
- **পরিকাঠামো পরিষেবার উন্নতি ও জেলাস্তরে বিস্তৃতি - পরিবহন ব্যবস্থায় কর্মকাণ্ডের ও বাজারের কেন্দ্রগুলির সংযুক্তি(।**
- **ছোট, বড় বা মাঝারি উৎপাদনশীল পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগের পরিবেশ ও সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা।**
- **কৃষিজ দ্রব্য ফল-ফুল - সব্জীর বাজার সংর(ণ ও ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা।**
- **উন্নয়নের উপযোগী ও কার্যকরী আইন-শৃঙ্খলা এবং মানবিক, অনুভূতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলে সব রকমের রাজনৈতিক চাপ ও প্রশাসনিক জটিলতা পরিহার করা।**
- **কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া, হুগলি, আসানসোল, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পু(লিয়া, বীরভূম, নদিয়া, দ(িণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণা থেকে উত্তরবঙ্গের শহরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।**

দারিদ্র দূরীকরণ ও বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিই হবে উন্নয়নের দিশা।

প্রশাসনিক সিপিএমীকরণ

উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমুখ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রে(িতে আরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। সমস্যাটি হল বামফ্রন্টের অপশাসনে অতি বিস্তৃত সর্বব্যাপী একদলীয় রাজনীতিকরণ, যার চাপে রাজ্যে সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হয়েছে ত্র(মাগত। ফলে হতোদ্যম হয়েছে সামাজিক উদ্যোগ ও সুস্থ কর্মসংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গে যথার্থ উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় বাধা এই সমস্যাটি।

গত ৩২ বছরের অপশাসনে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরগুলিতে কর্মসংস্কৃতি, কাজ করার উৎসাহ বা উদ্যম একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্কুল, কলেজ, বি(বিদ্যালয়, হাসপাতাল থেকে শু(করে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত যে কোনও প্রতিষ্ঠান -- সর্বত্রই একই চেহারা। নির্লজ্জ রাজনীতিকরণে স্বজনপোষণ চলেছে সরকারি ও মদতে, সরকারি অর্থে। সর্বত্রই সৃষ্টি হয়েছে প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত (মতা, যার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। সরকারি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক থেকে আরম্ভ করে থানার দারোগা বা কলেজের অধ্য(, বি(বিদ্যালয়ের উপাচার্য বা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট, সকলেই আছেন নামমাত্র পরিচালনার দায়িত্বে। আসল পরিচালনাটি হয় ওই প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত স্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলি থেকে এবং রাজ্য নেতাদের মদতে। সরকার চালাচ্ছে সিপিএম তাদের দলীয় দফতর থেকে, গড়ে উঠেছে একনায়কতন্ত্রের সোপান।

এই রাজনীতিকরণের ফলে কাজের পরিস্থিতি ও পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে সর্বত্র। কর্ম(ত্রে নিয়োগ, বদলি, এমনকি চাকরির শর্ত অনুযায়ী সুবিধাগুলো মেলে না দলীয় রাজনীতিতে নাম না লেখালে। এই চিত্রটি সর্বস্তরে -- সরকারি ডাক্ত(ার, শি(ক, কর্মচারী, পুলিশ বা আধিকারিকরাই শুধু নন, উচ্চপদস্থ আইএএস, আইপিএস, বা উপাচার্যকেও দলীয় রাজনীতিকে মানিয়ে চলতে হয়। না হলেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার কোপে নেমে আসবে খাঁড়া, জুটবে অশেষ লাঞ্ছনা, সে বেআইনি হলেও আইনের আশ্রয় মিলবে না। স্বভাবতই, রাজনীতিকরণের আত্র(ান্ত কর্ম(ত্রের প্রতিটি কোষেই আজ আর মেধা, দ(তা বা উদ্যোগের কোনও স্বীকৃতি নেই, বরং সে সব থাকলে আসে বিপত্তি। শি(ক-শি(কাদের চলতে হয় সিপিএম দলের নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে।

সামাজিক উদ্যোগের (ত্রেও একই চেহারা। এটাই আজ বামফ্রন্টের অপশাসনে নির্ধারিত সত্য যে যা কিছু হবে তার সবই দলীয় রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে হবে --- সবই নিয়ন্ত্রণ করবে প্রধান শাসকদলের রাজনৈতিক নেতারা। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিরাজ করছে প্রায় এক ধরনের ফ্যাসিবাদ। কোনও রকম বিতর্ক বা বিপরীত মতকে এখানে সহ্য করা হয় না। গণতন্ত্রের প্রারম্ভিক শর্ত এখানে লঙিঘত। এই দলীয়করণের চাপে ত্র(মশই সংকুচিত হয়েছে গণতান্ত্রিক পরিসর, যার ওপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি হয় সামাজিক উদ্যোগ। হতাশ, উদ্যমহীন সমাজে স্বভাবতই ব্যাহত হয় যে কোনও উন্নয়ন প্রত্রি(য়া। অনেক হৈ চৈ করে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় (মতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় স্বশাসনের জনগণের সত্রি(য় অংশগ্রহণের কথা প্রচার করে বামফ্রন্ট সরকার। বাস্তবে শাসক রাজনীতির নাগপাশে হতাশ উদ্যমহীন সমাজ কিন্তু একেবারেই নি(ৎসুক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে। রাজ্য সরকারের রিপোর্টেই (মানবোন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪, পৃঃ ৬৭) স্বীকার করা হয়েছে যে গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদের মিটিংগুলিতে ন্যূনতম উপস্থিতির হার ত্র(মশই কমে ৬ থেকে ১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বহু সময়েই উপস্থিতি না থাকায় মিটিং হতে পারছে না।

একথা আজ স্পষ্ট যে যদি সরকারি প্রশাসন ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত(না করা হয়, যদি রাজনীতির শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক পরিসরকে উন্মুক্ত(করা না যায়, হতাশ, উদ্যোগহীন, কর্মসংস্কৃতিহীন সমাজে আজ আর কোনও উন্নয়নের জোয়ার আনা যাবে না। শুধুমাত্র বিনিয়োগ দিয়েই সব হয় না(সামাজিক উদ্যোগ, সুস্থ কর্মসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক পরিসর উন্নয়নের আব্যশিক শর্ত।

এই উদ্দেশ্যে তৃণমূলকংগ্রেস **প্রশাসনিক ভূমিকায়** বিশেষভাবে গু(ত্ব দেবে ---

- **সরকারি প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত(করে নিরপে(প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।**
- **গণতান্ত্রিক পরিসরের পুন(দ্ধারের এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার র(ায় দলীয় রাজনীতির শাসনের বদলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।**
- **তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের সর্বস্তরে ধর্মনিরপে(তার পথেই সকল শ্রেণীর মানুষকে একসাথে নিয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।**

শিল্প ও বাণিজ্য

গ্রাম-শহরে কর্মরত ছোট ব্যবসা ও পেশায় নিযুক্ত(মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজি, কাঁচামাল, প্রযুক্তি(, পরিবহন ইত্যাদির সমস্যায় (দ্র উদ্যোগগুলি জর্জরিত। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, দলবাজি প্রভৃতির ফলে এই উদ্যোগগুলি দা(ণভাবে (গ্ন। (দ্র ও কুটির শিল্পসহ অর্থনীতির বিভিন্ন (ত্রে উদ্যোগী মানুষ একই রকম হতাশাজনক পরিস্থিতির শিকার। নিজেদের উদ্যোগে যারা দাঁড়াতে চান তাদের জন্য স্বচ্ছ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সহায়তার ব্যবস্থা নেই। নেই কাঁচামাল ও উৎপন্ন পণ্য বাজারজাত করার উপযুক্ত(পরিবেশ। সরকার এ(ত্রে চরমভাবে ব্যর্থ।

সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বামফ্রন্ট নানাভাবে রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির বিনাশ ডেকে এনেছে। এদের আমলে রাজ্যের শিল্প ও শ্রমিকের ভবিষৎ অন্ধকারে নি(প্ত হয়েছে। চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল তার বড় প্রমাণ। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দলের লেজুড়ে পরিণত করে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইউনিয়নগুলিকে দুর্নীতিপরায়ণ এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী করে তোলা হয়েছে। এরাজ্যে সিপিআই(এম) শুধু শ্রমিক স্বার্থই নষ্ট করছে তাই নয়, তারা বিপন্ন করেছে শিল্পের সামগ্রিক স্বার্থ। ফলে রাজ্যের অর্থনীতি বিকশিত হতে পারেনি। শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারগুলির ওপর নেমেছে ব্যাপক আত্র(মণ। হাজার হাজার কলকারখানা (গ্ন বা বন্ধ হয়েছে। ল(ল(শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা জেগে ওঠেনি। ল(ল(বেকার ছেলেমেয়ে সম্পদ না হয়ে এদেরই কারণে সমাজের বোঝা হয়ে আছে। শি(ত বেকারের সংখ্যা ত্র(মশই বাড়ছে।

দীর্ঘকালের বাম অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শিল্পোন্নয়নে এক অগ্রগণ্য রাজ্য থেকে আজ পরিণত হয়েছে এক পিছিয়ে পড়া রাজ্যে। শিল্প ও বাণিজ্যের (ত্রে আজ রাজ্যের সর্বাঙ্গে জরাজীর্ণ দশা। নথিভুক্ত(শিল্পসংস্থার উৎপাদনের হিসাবে ১৯৬০ দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসত দেশের মোট উৎপাদনের ২১ শতাংশ। আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। উৎপাদন বৃদ্ধির হারেও রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে ত্র(মাগত। ১৯৯৪-২০০১ সালে সারা দেশে বৃদ্ধির হার যখন ৭.৬৩ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা ছি ৩.৩৭ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যের ভিত আজ পুরোপুরি বিপর্যস্ত। (গ্ন শিল্পের সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সারাভারতের অন্য কোনও রাজ্য এই পরিমাণ (গ্ন শিল্পের দেখা মেলে না। গত পনের বছরে অন্তত ৫৫ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, ছাঁটাই হয়েছেন প্রায় ১৫ লাখ শ্রমিক কর্মচারী। আর নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৪৪ হাজার। (দ্র শিল্পের

ে ত্রে চিত্রটি আরও ভয়াল। প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার (দ্রশিল্প বন্ধ হয়ে গেছে, যা সারা ভারতের মোট বন্ধ (দ্রশিল্পে ৪৭ শতাংশ। এই বন্ধ (দ্র শিল্পের ৮৫ ভাগই চিরতরে বন্ধ, কোনও ভাবেই আর চলবে না। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে সংগঠিত ে ত্রে কর্মসংস্থান কমে গেছে --- ১৯৮০ সালে ছিল ২৬ লাখ ৬৪ হাজার, আর ২০০৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার।

বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের শাসন(মতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে বামফ্রন্ট সরকারের আদৌ কোনও শিল্পনীতি ছিল না। পরিবর্তে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের সংস্থা, বিশেষত (দ্র ও মাঝারি উদ্যোগুলি ত্র(মাগত নিষ্পেষিত হয়েছে পার্টির সংগঠন বৃদ্ধি ও পরিচালনার অর্থ জোগাতে। শুধুমাত্র স্থানীয়, আঞ্চলিক বা রাজ্যস্তরে পার্টির সম্পদই নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও পার্টির সম্পদ বৃদ্ধি ঘটেছে রাজ্যের শিল্প সংস্থাকে শোষণ করে(ত্র(মাগত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে নেতা ও পরিবারবর্গের, জুটেছে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের খরচ। ত্র(মাগত শোষণে নিঃস্ব, (গ্ন শিল্প সংস্থার গভীর সংকটের চিত্রটিকে আর অস্বীকার করতে না পেরে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার আর্ন্তজাতিক সংস্থার ঋণের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার বা (গ্ন শিল্পের পুন(জ্জীবনের জন্য নয়। এই ঋণ নেওয়া হচ্ছে কল-কারখানা বন্ধ করে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিদায় দিতে। চিন্তাদর্শে সর্বস্বান্ত ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে কোনও শিল্পনীতি নেই --- আছে শুধু তোতা পাখির মতো আউড়ে যাওয়া কয়েকটি শব্দ ---তথ্য প্রযুক্তি(, জৈব প্রযুক্তি(, খাদ্য প্রত্রি(য়াকরণ শিল্প। তথ্যপ্রযুক্তি(শিল্প নিয়ে অনেক হৈ চৈ করার পরেও দেখা যাচ্ছে রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি(র উৎপাদন সারা দেশের মাত্র তিন শতাংশ। রাজ্যে না আছে তথ্যপ্রযুক্তি(শিল্পের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত(শি(ণপ্রাপ্ত মানব সম্পদ, না আছে স্থানীয় বিস্তার আর চাহিদা ভিত্তি। তথ্যপ্রযুক্তি(র শিল্পের নামে গড়ে উঠেছে মূলত কিছু সংখ্যক বিপিও আর কলসেন্টার। স্থানীয় চাহিদা ও যোগানের ভিত্তি ছাড়া পুরোপুরি বি(্বেবাজারে বিপিও প্রত্রি(য়া নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি(শিল্পায়নের বিপদের দিকে কোনও নজর দেওয়া হয়নি। স্থানীয় ভিত্তি ছাড়া জৈব প্রযুক্তি(ও খাদ্য প্রত্রি(য়াকরণ শিল্পের ে ত্রেও একই সমস্যা আছে। অথচ বামফ্রন্টের চটকদারি শিল্পায়নের ে-াগান রাজ্যের শিল্পায়নকে ত্র(মাগতই বিভ্রান্ত করেছে, ভুল পথে চালিত করেছে।

শিল্প উৎপাদনে প্রতিযোগিতার স(মতার সূচক হিসাবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গকে ১৫টি বড় রাজ্যের মধ্যে ত্রয়োদশ স্থানে রেখেছে। রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোর এই অবস্থা কেন? কেন রাজ্যের (গ্ন শিল্প এতো ভয়াবহ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল? রাজ্যের বামফ্রন্ট নির্দেশিত শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতির কোনও স্তরের কোনও আলোচনাতেই এর উৎস সন্ধান ও তার নিরসনের কথা বলা হয়নি। অথচ রাজ্যের শিল্পায়নের সমস্যার উৎস সন্ধান ও তার নিরসন ছাড়া কোনওভাবেই আজ আর রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার আসা সম্ভব নয়।

বামফ্রন্টের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের বিশেষ কিছু প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে যা অন্যত্র চোখে পড়ে না। রাজ্যের উৎপাদনশীলতা ত্র(মাগত কমেছে বা অন্যভাবে বলা যায় য়ে রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের উৎপাদন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আর্থব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি উচ্চ উৎপাদন ব্যয়। এর কারণ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব আভ্যন্তরীণ অদ(তা নয়। কারণ প্রতিষ্ঠান-

বহির্ভূত শিল্প-বাণিজ্য পরিবেশের কিছু নেতিবাচক উপদেষ্টা, যা কেবল বাম শাসিত পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায়। অবাঞ্ছিত অথচ নিয়ন্ত্রণহীন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মূল কারণটি স্থানীয় সিপিএম নেতা ও সিটু নেতাদের মদতপুষ্ট বাহিনীর নিয়মিত তোলা আদায়। রাজ্যের প্রত্যেক শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা, বিশেষত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা (দ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি প্রতিনিয়ত শিকার হয়েছে এদের হয়রানি আর তোলাবাজির। এই একটি কারণ থেকেই ব্যাখ্যা মেলে কেন পশ্চিমবঙ্গে এতো ভয়াবহ সংখ্যায় (দ্র শিল্প ও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। রাজ্যের ঐতিহ্যশালী শিল্পনগরীগুলি আজ শ্মশানে পরিণত -- কল্যাণী, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, সালকিয়া, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ সর্বত্রই একই চেহারা।

বি(্বায়নের যুগ। প্রতিযোগিতার যুগ। অথচ উৎপাদন ব্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত কারণে বাড়তি বোঝা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ (দ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থার প(টিকে থাকা মুশকিল। উৎপাদন ব্যয় প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত বাড়তি বোঝার মুল চারটি কারণ দেখা যায়-

- সিপিএম ও সিটু নেতাদের মদতপুষ্ট তোলাবাজি।
- তুলনামূলকভাবে উচ্চহারে রাজ্যের সরকারের শুল্ক ও কর।
- উপযুক্ত(পণ্য পরিবহন, বাজার ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর অভাব
- অনাবশ্যক সরকারি নিয়মনীতি ও অনুমতি দেওয়ার ে ত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও গাফিলতি।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনে শিল্পায়নের জোয়ার আনতে তৃণমূল কংগ্রেস এই বিশেষ ল(্য শিল্পনীতি গ্রহণ করবে যেখানে গু(ত্ব পাবে ---

- ১৯৯১ সালে ২০০৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সময়কালে সমস্ত প্রকল্পের অনুমোদনের সংখ্যা, রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা প্রকল্প ধরে, বছর ধরে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পে জমির পরিমাণ, বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সহ অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।
- বিশেষ বিকল্প প্যাকেজ ঘোষণা।
- নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানমুখী ও (দ্র শিল্পে স্বনির্ভরতার ে ত্রে অনুদান, ঋণ সহ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে উৎসাহ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- আমলাতান্ত্রিক জট মুক্ত(করে শিল্পমুখী বাস্তব নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ নীতি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে গ্রহণ করা ও এ সম্পর্কে রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের সর্বদলীয় মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাজ্যের স্বার্থেই আয়রণ ওর (আকরিক লোহা) সম্পর্কে জাতীয় নীতি ঘোষণা করার দাবি জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- রাজ্যে শিল্প স্থাপনে রাজ্যের স্বার্থ র(া করে মানুষের সহযোগিতায় জনস্বার্থবাহী শিল্পায়নের নীতিকে সামনে রেখে সমস্ত বিনিয়োগকারীদের অনুদান, ঋণ ও উৎসাহ ভাতার ে ত্রে এক নীতি গ্রহণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- শিল্পায়নের উপযোগী পরিকাঠামো গঠনের ে ত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

- ✿ এই রাজ্যের উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমাঞ্চলের যে জেলাগুলি রাজ্যের অন্য জেলার তুলনায় আর্থিকভাবে অনগ্রসর সেই সমস্ত জেলাগুলিতে ও সুন্দরবন অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে বিশেষ তহবিল গঠন করে অতিরিক্ত উৎসাহ ভাতা, অনুদান ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- ✿ ম্যানুফ্যাকচারিং ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পায়নের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। শিল্পের সংগঠিত ক্ষেত্রে যে কর্মসঙ্কোচন আজ চলছে, তাকে বিপরীতমুখী করে কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নে উদ্যোগী হয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমজীবি মানুষের কর্মনিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে সরকারকে যত্নবান হতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পূর্ণ বিকাশে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে -- চা-পাট প্রভৃতি শিল্পের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হতে হবে।
- ✿ উপযুক্ত প্রযুক্তি ও বাজারে চাহিদার অভাবে কোনও শিল্প বা কারখানা যদি রুগ্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়, তার পুনরুজ্জীবনের জন্য রাষ্ট্রকে সদর্থ ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু চটজলদি মুনাফা লুটতে প্রোমোটরের সঙ্গে যোগসাজশে কারখানাকে রুগ্ন করার যে কোনও অপপ্রয়াসকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করতে হবে।
- ✿ বাজার অর্থনীতিতে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের নামে রাষ্ট্রের মধ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মতাভোগী **বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল** স্থাপন যে আদতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে কোনও দীর্ঘমেয়াদি লাভ সঞ্চার করতে পারেনি বরং রাজস্বভাণ্ডারে ক্ষতি করেছে দীর্ঘমেয়াদি ও ক্ষুণ্ণ করেছে দেশবাসীর নাগরিক স্বার্থ, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। এই ভুল নীতির বিলোপ সাধনের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস সক্রিয় থাকবে।
- ✿ **অসংগঠিত শিল্পের জন্য ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি করে সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবি মানুষদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করে অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।**
- ✿ চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বাতিল করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা দিতে হবে।
- ✿ তথ্য প্রযুক্তিতে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মনিশ্চয়তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ✿ জাতীয় বীমানিগমকে বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস। বীমানিগমকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে বীমাকারীদের সুরক্ষা ও আধুনিক দ্রুতগামী পরিষেবা দেবার দাবি জানায়।
- ✿ দেশের আভ্যন্তরীণ তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। এ বিষয়ে গঠিত পেট্রোলিয়াম তহবিলে রক্ষিত অর্থকে যথোপযুক্ত ব্যবহার করার দাবি জানায় দল।
- ✿ **ভূমি নীতি বলপূর্বক জমি নেওয়া যাবে না, কালো তালিকাভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগের ঢালাও ছাড়পত্র দেওয়া যাবে না।**
- ✿ **জমি ব্যবহারের জন্য Land Bank ও 'পরিচালন পদ্ধতি'-র ব্যবস্থা নেবে দল।**

- ✿ **বন্ধ কলকারখানা চালু করে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের (১৫ লক্ষ শ্রমিক) পুনরায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।**
- ✿ **বন্ধ কারখানার জমিতে কারখানা স্থাপন করার দাবি (জমি উদ্ধারে মনিটারিং সেল তৈরি করতে হবে)। নতুন করে চালু করে ১৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করতে হবে।**
- ✿ **রাজ্যে ভ্যাট নীতি বাতিল করতে হবে।**

সরকারি চালাকির জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে কীভাবে বলির পাঁঠা হচ্ছেন নানারকম ট্যাক্স, সেস ও ডিউটি'র বোঝায় — তারই কিছু প্রত্যক্ষ তালিকা নিচে দেওয়া হল। এতো করে বোঝা চাপিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বার বার পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি ছাড়াও অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম অহেতুক বাড়িয়ে দিচ্ছে।

কেন একজনকে অনেক রকম ট্যাক্স দিতে হবে? এতে ব্যবসা ধাক্কা খায়।

লক্ষ্য রাখুন এক নজরে মানুষকে কতবার কতক্ষেত্রে কতরকম ভাবে কর দিতে হয়!

TAX

1. Corporation Tax
2. Taxes on Income
3. Wealth Tax
4. Customs
5. Service tax
6. Surcharge on Motor Spirit
7. Land Revenue
8. Registration Fees
9. Value Added tax
10. Sales Tax
11. Taxes on Vehicles
12. Taxes on Goods and Passengers
13. Octroi
14. Professional Tax
15. Trade Licence Fee
16. Bengal Amusement Tax Act
17. WB Entertainment and Luxurious Tax
18. West Bengal Additional Tax on One-Time Tax on Motor Vehicles
19. Property tax
20. Howrah Bridge Tax
21. Works Contract tax
22. Water Tax
23. Agricultural Income Tax
24. Advertisement Tax
25. Security Transaction Tax
26. Commodity Transaction Tax
27. Banking Transaction Tax
28. Fringe Benefit Tax
29. Central Sales Tax
30. Turnover Tax
31. Terminal Tax on Railway Passengers Act.
32. The Medicinal And Toilet Preparation (Excise Duties) Act, 1955.
33. Expenditure Tax

CESS

1. Cess on Motor Spirit
2. Cess on High Speed Diesel Oil
3. Education Cess
4. Secondary and Higher Education Cess
5. Agricultural Produce Cess
6. Cess on Tea
7. Cess on Oil
8. Cess on Rayon Fibre
9. Welfare Cess on Bidi
10. cess on Matches
11. Cess on Rubber
13. Cess on Coffee
13. Cess on Manmade Fibre
14. Passengers Cess on Straw Board
15. Cess on Automobile
16. Cess on Other Commodities
17. Cess on Jute
18. Cess on Copra
19. Cess on Woollen Fabrics
20. Cess on Cotton
21. Cess on Tobacco
22. Cess on Crude Oil
23. Cess on Sugar
24. Cess on Paper
25. Cess on Vegetable Oil
26. Cess on Iron Ore
27. Cess on Chrome Ore
28. Cess on Limestone and Dolomite
29. Cess on Manganese ore
30. Cess on Coal
31. Cess on Domestic Manufacture of paper and Salt
32. Cess on Feature Film

DUTY

1. Union Excise Duties
2. Import Duty
3. Additional Duty of Customs (CVD)
4. Special CV Duty
5. National Calamity Contingency Duty
6. Stamp Duty
7. State Excise Duties
8. Taxes and Duties on Electricity
9. Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act.
10. Additional Duties of Motor Spirit
11. Special Additional Duty on Motor Spirits
12. Additional Duty on TV sets
13. Duty on Generator of Power
14. Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act.

আমাদের মূল দাবিসমূহ —

- **স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ বৃদ্ধি ও বীমা - রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প র(া ও শক্তি(শালী করা।**
- **শপিং মলের খুড়োর কল বন্ধ করতে হবে।**
- **খুচরো ব্যবসাতে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ খতে হবে।**
- শিল্প-বাণিজ্য সংক্র(ান্ত সরকারি নিয়ম-নীতির বাহুল্য বর্জন করে তাকে যুক্তি(গ্রাহ্য করা -- যাবতীয় নিয়ম-নীতিকে একত্রিত করে একটি মাত্র সরকারি নির্দেশনামায় প্রকাশ করা।

- শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক তোলাবাজি ও হয়রানি থেকে মুক্ত(করে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- যথার্থ শিল্প-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে সকল আগ্রহী দেশি-বিদেশি শিল্প বিনিয়োগকারীকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো।
- বৃহৎ শিল্প থেকে অনুসারী শিল্প—শিল্পায়নের এই সাবেকি তথাকথিত বামপন্থী ধারণার পরিবর্তে বর্তমান যুগের শিল্পায়নের চরিত্র অনুযায়ী অসংখ্য (ুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিবেশে বৃহৎ শিল্প গড়ো—এই ধারণাকেই প্রাধান্য দেওয়া। টপ-ডাউন এ্যাপ্রোচ-এর পরিবর্তে বটম-আপ এ্যাপ্রোচ নেওয়া।
- প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে শিল্পনগরী স্থাপন করা।
- অসংগঠিত (ে ত্রের শ্রমিক যেমন হকার, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, সবজি বিক্রে(তা, রাজমিস্ত্রী সহ বিড়ি বাঁধা থেকে বিভিন্ন হস্তশিল্পে নিযুক্ত(মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- (ুদ্র ও শ্রমনিবিড় শিল্পায়নে জোর দেওয়া।
- গ্রামীণ ও কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্পায়ন।
- শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো—জল, বিদ্যুৎ ও রাস্তার ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন ও নিকাশী ব্যবস্থা।
- রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলায় স্থানীয় দ(তা ও ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে ওঠা কুটির ও হস্তশিল্পকে পুন(জ্জীবিত করা ও এগুলির বাজার ব্যবস্থা এবং সমবায়িক বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্যের জেলাভিত্তিক স্থানীয় বাজার ও পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- উত্তরবঙ্গের চা-বাগান ও দ(িণবঙ্গে জুটমিলগুলির পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পুন(জ্জীবন ঘটানো।
- পরিষেবা শিল্পের নামে ঢালাও মদের দোকান এর লাইসেন্স প্রদান সামাজিক অব(য় ডেকে আনে, এর বি(দ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।
- শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার পরিচালক গোষ্ঠী ও শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থের অপ্রয়োজনীয় সংঘাত নয়, তাদের যৌথ স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো।
- (গ্ন (ুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুন(জ্জীবন ও পরিচালনায় শ্রমিক সমবায় গড়তে সাহায্য করা।
- অনুন্নত জেলা ও অঞ্চলে শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া।
- স্থানীয় কর ও শুল্ক পরিকাঠামোর পরিমার্জন ও পুনর্গঠন।
- বর্তমান 'পণ্যসামগ্রী ও পরিষেবা'র বিভিন্ন প্রকার কর এবং সেনভ্যাট ও ভ্যাট প্রথা তুলে দিয়ে দেশব্যাপী সরলীকৃত কর ব্যবস্থার ল(্যে ''ইউনিফর্ম কর'' ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায় দল।
- তথ্যপ্রযুক্তি(শিল্প ও পরিষেবার স্থানীয় ভিত্তি গড়ে তোলা ও চাকরির নিরাপত্তা দেওয়া।
- পর্যটন শিল্পকে বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে প্রসারিত করা।

- ✿ বন্ধ কলকারখানার জমিকে নির্দিষ্ট করা, নতুন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।
- ✿ স্বর্ণশিল্প, জরির কাজসহ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত(ব্যক্তি(দের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- ✿ রাজ্যের অধিকাংশ রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পের (গ্নতার মূল কারণ পরিকল্পনাহীন অযোগ্য পরিচালনা ও পার্টি ও সিটু নেতাদের বিলাসবহুল ভরণপোষণের দায়ভার। এগুলি বন্ধ হলেই অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। রিষ্ট্রাকচারিং-এর নামে পেছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিত্রি(নয়, যোগ্য পরিচালনায় শিল্পগুলিকে লাভজনক করে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া।
- ✿ আ(রিক অর্থেই চিরতরে (গ্ন বা বন্ধ কল-কারখানার অবশিষ্ট সম্পদের সঙ্গে নতুন মূলধনী ঋণের ব্যবস্থা করে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করাকে গু(ত্ব দেওয়া।
- ✿ (ুদ্র ও মাঝারি পণ্য ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা কমিয়ে ও মূল্যযুক্ত(কর (VAT) প্রত্যাহার করে পণ্য ব্যবসার বিকাশ ও প্রসার করা।
- ✿ বর্তমানে কর ব্যবস্থার মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তা দূর করে একটি ইউনিফর্ম ট্যাক্সের প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন। ইউনিফর্ম ট্যাক্স প্রথা সমস্ত রকম করের (কাস্টম/শুল্ক/ভ্যাট-মূল্যযুক্ত(কর) জায়গায় প্রবর্তন করা দরকার।
- ✿ পণ্য ও পরিষেবা-এর ওপর ১২ শতাংশ হারে কর নিয়ে VAT-সহ কাস্টম/শুল্ক/ভ্যাট নেওয়া বাতিল করতে হবে। এই ইউনিফর্ম ১২ শতাংশ হারে কর গ্রহণ সমগ্র দেশে চালু করতে হবে যাতে সারা দেশে ইউনিফর্ম 'পণ্য ও পরিষেবা'-র একই রকম করদাতাদের কর দিতে হয়। এই করের সংগৃহীত অর্থ ৫ শতাংশ রাজ্য, ৫ শতাংশ কেন্দ্র ও ২ শতাংশ রাজ্যের লোকালবডির কাছে যাবে। জনকল্যাণমুখী কাজে তা ব্যবহার হবে। সে(ত্রে রাজ্যের হাতে মোট সংগৃহীত ১২ শতাংশ করের ৭ শতাংশ যাবে। কেন্দ্রের কাছে থাকবে ৫ শতাংশ সংগৃহীত অর্থ।
- ✿ Public sector-কে সুর(িত ও শক্তি(শালী করতে হবে।
- ✿ শিল্প ও কৃষির মধ্যে সেতু স্থাপন করতে হবে।

কৃষি

সিপিআই(এম) শাসিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্থনীতি নিদা(ণভাবে অব(দ্ধ হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন, ভূমি সংস্কারের সাফল্য, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে সরকার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গল্প প্রচার করে চলেছে। ভূমি সংস্কারের প্রাথমিক কিছু সাফল্যের পর বহু প্রয়োজনীয় কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ধারাবাহিক উন্নয়নের উপযুক্ত(ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কৃষি (ে ত্রে বিপরীত যাত্রা শু(হয়েছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় পশ্চিমবঙ্গ আজও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। পাঞ্জাবের কৃষি উৎপাদনশীলতা আমাদের থেকে দেড়গুণেরও বেশি। সিলিং বহির্ভূত জমি যারা পেয়েছিলেন, জমি ছাড়া অন্যান্য সহায়তা দিয়ে সেই জমিকে আরও

ফলনশীল করে তোলার (ে ত্রে কোনও প্রচেষ্টাই প্রায় হয়নি। উৎপাদনশীলতা বাড়েনি। ফলে কর্মদিবস বাড়েনি। কৃষকের দারিদ্র কমেনি। তাই বাড়েনি কৃষকের ত্র(য়(মতা। শিল্পপণ্য কিনবে কে? ত্রে(তা কম হলে শিল্পের বিকাশ কম হবে। গ্রাম থাকবে অন্ধকারে। তাই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কৃষি(ে ত্রে পুঁজি বিনিয়োগের মতো পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। কৃষকের মালিকানা বজায় রেখে চাষের জমির পুনর্বিন্যাস তথা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি বিকাশের পথ অবহেলিত থেকেছে। পুঁজি নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে যারা জমি পেয়েছিলেন, তারা অনেকেই জমি হারাতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে জমিই পাননি। খাস জমি বিলি অসম্পূর্ণ আছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে। কৃষি(ে ত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি(র যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। বিশেষ করে জৈব প্রযুক্তি(প্রয়োগে রয়েছে চরম অপদার্থতা। কৃষি গবেষণাও অবহেলিত থেকেছে। খরা ও বন্যার সঙ্কট থেকে কৃষিকে বাঁচানোর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নদনদী, খালবিল সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ও সেচ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার (ে ত্রে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ। তিস্তা প্রকল্প আজও বাস্তবায়িত হল না। অন্যদিকে সরকার শস্যবীমার প্রকৃত কোনও বন্দোবস্ত করেনি। জমির চরিত্র অনুযায়ী ও আবহাওয়াভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ ফসল নির্বাচন করে কৃষি বিকাশের বৈজ্ঞানিক পথ গ্রহণ করা হয়নি। কৃষক যাতে ফসলের লাভজনক দাম পায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়নি। দুর্দশাগ্রস্ত গরিব কৃষক অভাবের সময় কম দামে ফসল বিত্রি(করতে বাধ্য হয়। অভাবী বিত্রি(রোধ করার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করেনি সরকার। এ(ে ত্রে বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল ব্যবহারের প্র্রেও রাজ্য পিছিয়ে রয়েছে। উৎপন্ন ফসল সংর(ণ ও শিল্পে তাকে ব্যবহার করে কৃষকের জীবনকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্গাদার তথা ভাগচাষিদের রায়তী স্বত্ব দিয়ে তাদের জন্য ঋণ ও অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। বর্গাদাররা বহু(ে ত্রে বর্গার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছেন। (ে তমজুরদের জীবন মানের উন্নতি হয়নি। অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র, পশ্চাদপদ আজও তাদের নিত্য সঙ্গী। এরাজ্যে কৃষিতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পুঁজির মাত্র ১০-১৩ শতাংশ ঋণ আসে ব্যাঙ্ক থেকে। বাকি প্রায় ৯০ শতাংশ পুঁজির জন্য কৃষকরা চড়া সুদে মহাজনের মুখাপে(ী।

১৯৪৭-এ দেশভাগের ফলে অধিকাংশ উর্বরা জমি ওপার বাংলায় চলে গেলেও পশ্চিমবঙ্গের কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫১ সালে পশ্চিমঙ্গে মাথাপিছু নীট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল দৈনিক ৩৮১ গ্রাম। তখন ভারতে মাথাপিছু নীট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের থেকে ১২ শতাংশ কম বা মাত্র ৩৩৪ গ্রাম। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার (মতাসীন হওয়ার মাত্র ৯ বছর বাদেই ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনে জাতীয় গড়ের চেয়ে ২৬ শতাংশ বা ১২৫ গ্রাম পিছিয়ে পড়ল। সেই অবনমন আজও অব্যাহত। কৃষি-উৎপাদনে গত ৩২ বছরে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নাকি খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে, এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের দাবি। আর তার জন্যই নাকি বুদ্ধ-জমানার (ে-াগান—''কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ''। অথচ যারা শিল্পে বিনিয়োগ ঘটান, ভারতের সেই শিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি' ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা-সমী(া সংস্থা 'কেপিএমজি' যুগ্মভাবে ডিসেম্বর ২০০৭-এ প্রকাশ করেছে—

'Sustainable economic development in West Bengal–A Perspective.' যাতে স্বীকার করা হয়েছে যে, West Bengal has not achieved Food Security in any food crop except rice and potato.' কারণ গম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি আজও প্রয়োজনের তুলনায় ৫০ শতাংশ, ডালে ৭৫ শতাংশ ও তৈলবীজে ৬০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, চাষের উর্বর জমি অধিগ্রহণেও বিস্ময় প্রকাশ করে সিআইআই জানিয়েছে যে, গোটা ভারতে যেখানে অনুর্বর জমি হচ্ছে ১৭ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১ শতাংশেরও কম। অথচ ম্যাকিনসের পরামর্শত্র(মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধুনা যে কৃষিনীতি ঘোষণা করেছে, তাতে গু(ত্বের অভিমুখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে খাদ্যশস্য চাষের বদলে বাণিজ্যিক চাষ বা মূলক যে সব শস্যের বিদেশে বাজার আছে, তার প্রতি! অচিরেই মহারাষ্ট্রে গমের বদলে বাণিজ্যিক তুলো চাষ হবে। বিপুল তুলো চাষে এগিয়ে থাকা বিদর্ভে দেখা দিয়েছে আত্মহত্যা ও অনাহারে মৃত্যুর মিছিল। বামফ্রন্টের ভ্রান্ত কৃষিনীতি সেই সর্বনাশই আহ্বান করছে।

এস ই জেড-এর মতোই কৃষি রপ্তানি অঞ্চলের ওপর দেওয়া হয়েছে অত্যধিক গু(ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ যে ধান উৎপাদনের জোরে খানিকটা স্বয়ম্ভর, ম্যাকিনসের পরামর্শে সেই ধানচাষ থেকে জমি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, যেসব শস্য বহুজাতিক ও বড়ো সংস্থাগুলো চাইছে যেমন সুগন্ধি ও স(চাল, আনারস, লিচু, আম, টম্যাটো, ফুল, মশলা ইত্যাদি চাষে জোর দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যদিও মাথাপিছু খাদ্যশস্যের হিসাব দেখলে বুদ্ধ-সরকারের ভারতে বৃহত্তম চাল-উৎপাদকের গরিমা একেবারেই ম্লান হয়ে যাবে। আশির দশক থেকে মাথাপিছু উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮১ সালে ৩৬৪ গ্রাম দৈনিক মাথাপিছু বাৎসরিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের গড় ছিল ১৫০ কেজি। ২০০০-০১ সালে যা হয়েছে ১৫১ কেজি! ফলে ১৯৯৯-২০০০ সাল নাগাদ মাথাপিছু দৈনিক ন্যূনতম ২৪০০ ক্যালোরি জোটেনি ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ ভারতীয়র আর পশ্চিমবঙ্গে ৭৭ শতাংশরও বেশি গ্রামীণ বাঙালির! ধানের মতো আলু ফলনেও পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে। সিঙ্গুর আলুর শ্রেষ্ঠ গ্র্যানারি বলে পরিচিত। সরকার টাটার স্বার্থে সেই সেরা ফসলি জমি গা-জোয়ারি অধিগ্রহণ করে অনুৎপাদক খাতে ফেলে রেখে দিয়েছে। যে ভ্রান্ত অধিগ্রহণ নীতির বি(দ্ধে সি আই আই ও বলেছে যে, "Singur and Nandigram have demonstrated the administrative difficulty in acquairing fertile land for industry. But low yielding agricultural land found, for instance, in the arid parts of Purulia and Bankura, should probably present no such problem."

সিপিআই(এম) ও তার যে উচ্ছিষ্টভোজী সাঙ্গপাঙ্গরা সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে 'মা-মাটি-মানুষের' লড়াইয়ের ঐতিহাসিক সাফল্যকে উন্নয়নবিরোধী আত্মহনন বলে বিদ্রুপ করছিলেন এবং রতন টাটা ও নরেন্দ্র মোদীকে বাংলার মার্গদর্শক বলে অভিষিক্ত(করছিলেন, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের বৃহত্তম প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা সিআইআইর এই বি(ে-ষণ ও স্বীকারোক্তি(তে বোধহয় তাদের সম্বিত ফিরবে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন কর্পোরেট চাষ ও কনট্রাক্ট ফার্মিংয়ের কথা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার। এটি চাষির আর্থিক ঋণভার বাড়াবে ও তার জীবন-ধারণের মানে হ্রাস ঘটাবে। ৫৯তম জাতীয় নমুনা সমী(াতেও ভারতে নিজস্ব জমিতে চাষ করা চাষিদের Situation Assessment Survey 2003 Reort অনুসারে চাষিদের মধ্যে ঋণগ্রস্ত পরিবারের জাতীয় গড় যেখানে ৪৮.৬ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে সেটি কিন্তু ৫০.১ শতাংশ এবং All

India Credit & Investment Survey 2002-03 অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবার পিছু গড় ঋণদায় (Debt Liability) ১৫,৪৬৬ টাকা!! আধুনিক বা সনাতনী অর্থনীতি কিম্বা মার্কসবাদী বা গান্ধীবাদী কোনও দর্শকেই অস্বীকার করেনি যে সব মানুষেরই দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার প্রয়োজন। অন্য কিছু না জুটলেও অন্তত চাই ভরপেট ভাত-ডাল-(টি-তরকারি। এখনও পর্যন্ত চাষবাস ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে এর উৎপাদন হয়েছে, এমন কথা শোনা যায়নি। অবশ্য পর্যাপ্ত উৎপাদন হলেও, তা কেনার জন্যও সঙ্গতি থাকা চাই। কিন্তু সঙ্গতিহীনতার সঙ্গে যদি প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত উৎপাদন হয়, তাহলে দুর্ভি(অবশ্যম্ভাবী। আমলাশোল ঘটনা ভুলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দু-চার ফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে আপাত অলাভজনক কৃষি থেকে শিল্পের পথে উন্নয়নের যাত্রার গল্প শু(করেছে বামফ্রন্ট। এটি আদতে পরিকল্পনহীন-স্বপ্নহীন এক দুঃস্বপ্ন রচনার সংগঠিত অপচত্র(ান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। যেনতেন প্রকারেণ চাষ লাভজনক নয় প্রচার করে, শিল্পায়ন-উন্নয়নের মুখোশ পরে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩.৫ শতাংশ কৃষিজমি থাকলেও সেই অল্প জমি থেকেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি অধিগ্রহণ করে, চাষিকে নামমাত্র নগদবিদায় দিয়ে, চাষবাস শিকেয় তুলে বাংলায় আবার দুর্ভি(-মন্বন্তর ডেকে আনাই মনে হয় সিপিআই(এম)-এর ল(্য।

রাজ্যের মোট ৮.২ কোটি জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ বা প্রায় ৬ কোটি মানুষ গ্রামে বাস করেন ও কৃষি সংত্র(ান্ত বিভিন্ন কাজ থেকে জীবিকা-নির্বাহ করেন। স্বভাবতই, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষিকাজ ও গ্রামোন্নয়নের বিশেষ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র শিল্পায়ন-নির্ভর উন্নয়ন কখনওই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন আনতে পারবে না। কৃষিজমি, যা মাটির মানুষদের কাছে মা, সেই জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে বিদেশি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সালেমদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসা করতে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি(ত্রে এক বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্টের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে কোনও সার্বিক কৃষিনীতি ছিল না। ছিল না কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও দূরদর্শিতার পরিচয়। ফলে ১৯৮০ দশকের অপরিণামদর্শী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফল ভোগ করতে হচ্ছে এমন। কৃষি(ত্রে এসেছে মন্দা। প্রথমত, রাজ্যের খাদ্য সুর(া আজ বিপন্ন। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার সরকারি প্রচার সর্বৈব মিথ্যে। বর্তমানে রাজ্যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন মোটামুটি ১.৬০ লাখ টন, যা ২০১০ সালে বেড়ে হবে ১.৮০ লাখ টন। আর উৎপাদন হয় মোটামুটি ১.৫০ লাখ টন। রাজ্যের কৃষিজমি কমছে। এখনই হিসেব পাওয়া গেছে যে প্রায় ৫ লাখ একরেরও বেশি কৃষিজমি পরিবর্তিত হয়েছে অকৃষিজমিতে। খাদ্য সুর(া তাহলে নিশ্চিত হবে কীভাবে? স্বভাবতই প্র(জাগে এমনটা কেন হচ্ছে, বামফ্রন্টের কোন কৃষিনীতির ফলে এই পরিণতি।

বামফ্রন্টের অপশাসনে এক গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিপজ্জনক সংখ্যায় পুরোপুরি ভূমিহীন (তমজুরের বৃদ্ধি ঘটেছে। বামফ্রন্টের আমলে ৪০ লাখ মানুষ ভূমিহীন (তমজুরে পরিণত হয়ে এখন মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৪ লাখ, যা কৃষিকাজে নিয়োজিতদের ৫৭ শতাংশ। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কারণ এই পুরোপুরি ভূমিহীন (তমজুরদের প্রায় সকলেই চূড়ান্ত দারিদ্রে নিমজ্জিত—এরা আইনত প্রাপ্য ন্যূনতম মজুরিটুকুও পায় না। গরিব দরদী (?) বামফ্রন্ট ৩২ বছরে এই কাজটুকুও করতে পারেনি।

কৃষি(ে ত্রে উৎপাদন ব্যয় ত্র(মাগত বেড়েছে, কিন্তু কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্যটুকুও তাদের হাতে পৌঁছোয় না। বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ, সেচের খরচ, সার ও কীটনাশকের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অথচ কৃষিপণ্যের সংর(ণ ও বিপণনের কোনও সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করেনি। ফলে কৃষক অধিকাংশ সময়ই আজও বাধ্য হয় স্থানীয় ফড়ে ব্যবসায়ীদের কাছে কম দামে ফসল বিত্রি(করে দিতে। তাই ভোক্ত(ারা যে চূড়ান্ত দামে কৃষিপণ্য কেনে তা তার ১০ থেকে ২০ শতাংশের বেশি গ্রামের কৃষকের কাছে পৌঁছোয় না।

একথা আজ স্পষ্ট যে বামফ্রন্ট সরকার এটাই চায় যে কৃষি (ে ত্রে এই সংকটটাই আরও ঘনীভূত হোক, কৃষকরা বাধ্য হোক জমি ছেড়ে দিতে। কারণ উন্নয়নের নামে হাজার হাজার একর জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করে বড় বড় বিদেশি প্রমোটারদের দিয়ে উপনগরী বানানো ছাড়া এই সরকার আর কিছু বোঝে না। রাজ্য ও দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে এইভাবে বিদেশি জমি গেলার হাঙ্গরদের উপনিবেশ স্থাপন করতে জমি দেওয়া চলেছে নির্বিচারে -- রাজারহাট থেকে ভাঙ্গর, সলপ, উলুবেড়িয়া, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, ডানকুনি, রায়চক, নন্দীগ্রাম থেকে শু(করে সর্বত্র। তাই কৃষিতে উৎপাদন ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। উল্টে সরকারই এই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে বামফ্রন্ট সরকার সেচের কাজে ব্যবহৃত পাম্পের বিদ্যুৎ - মাশুল একলাফে বাড়িয়েছে ৫৪৬০ টাকা থেকে ১০৯৩০ টাকা। ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দামও এই রাজ্যে অত্যধিক। কৃষকদের বহুদিনের দাবি ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ৫০ পয়সা করে হোক। কৃষকদরদী (?) বামফ্রন্ট সরকার এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি।

ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য পাওয়ার বিষয়েও রাজ্যের কৃষকরা চূড়ান্ত অবহেলিত। বামফ্রন্ট সরকার ৩২ বছরেও এই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ধান কেনার সরকারি সহায়ক মূল্য কখনওই ঠিক সময়ে, ফসল ওঠার আগে, ঘোষণা হয় না। ঘোষণা করার পরেও দেখা যায়, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে কেনার কোনও ব্যবস্থা সরকার গড়ে তোলেনি। চাল সংগ্রহের (ে ত্রেও একই চেহারা। আলু, সবজি, ফল, ফুল, পান ইতাদির (ে ত্রে সংর(ণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাবে কৃষকদের সমস্যা আরও তীব্র। রাজ্যে মোট আলু উৎপাদন যা হয় তার থেকে হিমঘরের সংর(ণ (মতা অনেক কম। ফলে কৃষকরা বাধ্য হন উৎপন্ন কৃষিপণ্যকে জলের দরে বিত্রি(করে দিতে। সুলভ মূল্যে সার পাওয়া যায় না, সারে চলছে কালোবাজারি।

কৃষিপণ্যকে সরাসরি বাজারে বিত্রি(করাও এক বিশেষ সমস্যা। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামের (ুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের কাছে। রাজ্যে আছে মাত্র ৪৮টি নিয়ন্ত্রিত বাজার আর সাড়ে তিন হাজার খুচরো বাজার। এই বাজারগুলিতে আছে ফড়ে ব্যবসায়ী আর সিপিএমের ক্যাডার বাহিনীর তোলাবাজি। এদিকে রাজ্যের ৭১ শতাংশ গ্রামের সঙ্গে কোনও পাকা সড়কের যোগ নেই। ৫০ শতাংশ গ্রাম নিকটবর্তী শহর বাজার থেকে ২০ কিমি বা আরও বেশি দূরে অবস্থিত। বামফ্রন্ট সরকার ৩২ বছরে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়নি। এমনকি গ্রামীণ সড়ক যোজনার টাকাও ফেরত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

সেচ ব্যবস্থা

(১) বামফ্রন্টের অপশাসনের আর এক নিদর্শন মেলে সরকারি সেচ ব্যবস্থায়। রাজ্যে আপাতত কাছে মাত্র দু'টি বড় সেচ প্রকল্প, তিস্তা আর সুবর্ণরেখা, যা শু(হয়েছিল বহু কাল আগে, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি আজও। তিস্তা প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছিল পঞ্চম পরিকল্পনায় (১৯৭৫-৮০), আর সুবর্ণরেখা অনুমোদিত হয়েছিল অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭)। এছাড়া মাঝারি সেচ প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছিল ৫টি পঞ্চম পরিকল্পনায় ও ৩টি সপ্তম পরিকল্পনায়। বামফ্রন্ট সরকার নতুন কোনও প্রকল্প তো নিতে পারেই নি, এগুলিকেও সম্পূর্ণ করতে পারেনি। রাজ্যের কৃষি আজও সেচের পর্যাপ্ত জলের অভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এদিকে বামফ্রন্ট সরকার তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে প্রচার করছে যে রাজ্যের ৬৫ শতাংশ কৃষিজমি সেচের জল পায়। এই হিসাব করা হচ্ছে সেচের আওতায় দু-ফসলি, তিন-ফসলি জমিকে ধরে মোট জমির হিসাবে ব্যক্তি(গত উদ্যোগের শ্যালো টিউবওয়েলগুলির সেচকে ধরে, যে ব্যাপারে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। বাস্তবে রাজ্যের মূল কৃষিজমির মাত্র ২৬.১ শতাংশ সরকারি সেচের জল পায়। সারা ভারতে এর গড় হল ৪০.২ শতাংশ। পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো রাজ্যে অঙ্কটি ৯০ শতাংশের বেশি।

(২) সরকারি সেচ যে অপ্রতুল শুধু তাই নয়, গত দশ বছরে সরকারি সেচের আওতায় কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে। বামফ্রন্টের অপশাসনে ও ভ্রান্ত নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে অন্য আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। সারা ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সরকারি সেচের অভাবে রাজ্যের কৃষি নির্ভর করে মূলত ব্যক্তি(গত অগভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ জলের ওপর। ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ শোষণে জলস্তর নেমে গেছে, উর্বরতা কমেছে ত্র(মাগত। একে সামলাতে ঘটেছে রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ প্রয়োগ। গত বিশ বছরে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ হেক্টর প্রতি ৩৫ কেজি থেকে বেড়ে ১৩৫ কেজি হয়েছে, যা সারা ভারতের গড়ের থেকে অন্তত ৩০ শতাংশ বেশি। ফলে কৃষির খরচও বেড়েছে, পরিবেশ দূষণও ঘটেছে। রাজ্যের সেচে অগভীর নলকূপের বিপজ্জনক বৃদ্ধি ও ফলে ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ শোষণে আর এক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে আর্সেনিক দূষণ। রাজ্যের ৯টি জেলায় কমপ(ে ৮ কোটি মানুষ আজ আর্সেনিক দূষণের কবলে। সরকারি হিসাবেই ৭টি জেলায় ১ কোটি ৩০ হাজার মানুষ এই দূষণে এখনই আত্র(ান্ত। বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাতে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টকে পর্যন্ত রাজ্য সরকারের প্রতি আদেশ দিতে হয়েছে।

(৩) বামফ্রন্টের অপশাসনে বিপর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থার সামনে আজ অগণিত সমস্যা আর সংকট। বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, বন্যা ত্রাণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি, অথচ রাজ্যের ৪২ শতাংশ এলাকাই বন্যাপ্রবণ। ফসল ও ঘরবাড়ির (তি হলে কৃষককে (তিপূরণ দেওয়ার কেন্দ্রীয় প্রকল্প আছে। কিন্তু সে সব টাকা লুঠপাট হয়ে যায় স্থানীয় নেতাদের চত্র(ান্তে। 'ইন্দিরা আবাস যোজনা'-র নির্দিষ্ট টাকাও জোটে না বিপদগ্রস্ত কৃষকের। সরকারি বীজ কেনার টাকা নয়ছয় হয়েছে বার বার। নিকৃষ্ট মানের সরকারি বীজ ব্যবহার করে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছে — পুড়িয়ে দিয়েছে (ে তের ফসল।

(৪) সংকটাপন্ন পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে সুস্থির করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কৃষি নীতির নামে সরকারের খামখেয়ালি চিন্তাভাবনাকে কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়, সরকারের মূল কাজ চারটি --- ভূপৃষ্ঠের জল নির্ভর সরকারি সেচ ব্যবস্থার প্রসার, কৃষি উপাদানের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কৃষি পণ্যের সংর(ণ ও সরাসরি বাজারে বিক্রি(করার সুবন্দোবস্ত, এবং উপযুক্ত(প্রযুক্তি(, সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি ঋণের সরকারি ব্যবস্থা। উক্ত(চারটি মূল বিষয়কে গু(ত্ব দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সার্বিক কৃষিনীতির ল(্য থাকবে—

- ✿ সেচ যোগ্য জমিকে দ্রুত সেচের আওতায় এনে উৎপাদন (মতা বৃদ্ধির ল(্যে কাজ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- ✿ রাজ্যবাসীকে আর্সেনিক মুক্ত(পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রূপায়ণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- ✿ পরিশ্রুত পানীয় জলের উৎস স্থাপন ও র(ণাবে(ণের সাথে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টিতে নতুন উদ্যোগে উদ্ভাবন পদ্ধতির ওপর জোর দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। এ ব্যাপারে সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থানের। যার সাথে যুক্ত(হবে সং(ি-ষ্ট অঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীরা।
- ✿ দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার ল(্যে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় কর্মশক্তি(র বৃহত্তম অংশ আজও যখন 'কৃষিকর্মে' নিযুক্ত(, তখন এই শ্রমশক্তি(র সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই দেশের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অংশ ও অবদান বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে কৃষিজীবি মানুষ আর্থিক স্বয়ম্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেন। দেশের সামগ্রিক কৃষিজমিকে আরও উৎপাদনশীল করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সেচসেবিত করতে হবে। বীজ, সার, কৃষিঋণকে সহজলভ্য করতে হবে। শস্যবীমার আওতায় আনতে হবে সমস্ত ফসলকেই। বৃদ্ধি করতে হবে ফসলের সহায়ক মূল্য। বাজার বা মান্ডি থেকে ফড়েদের ফাটকাবাজি নির্মূল করে উৎপাদক যাতে তার পণ্যের ন্যায্য দাম পায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভূমিসংস্কারকে আমূল ও উৎপাদনমুখী করতে হবে। বর্গাদার ও ভূমিহীন খেতমজুরের জীবিকা ও আর্থিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ✿ ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া ঔপনিবেশিক কালা কানুন - ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ বাতিল করতে হবে। শিল্পায়নের নামাবলী গায়ে দিয়ে বেসরকারি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে উর্বরা কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। অনাবাদী সহ অব্যবহৃত জোত ও জমির তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' তৈরি করতে হবে। অকৃষি খাতে জমির সদ্ব্যবহারের জন্য, মানবিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় পুনর্বাসন নীতি প্রস্তুত করতে হবে।
- ✿ বর্তমান জমি অধিগ্রহণ নীতি বাতিল করে তা সংশোধন করতে হবে।
- ✿ সেজ (SEZ) আইন বাতিল করতে হবে।
- ✿ কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য ও কৃষি উপাদানের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে।

- ✿ কৃষিপণ্যের সংর(ণে উপযোগী হিমঘর ও স্থানীয় বাজার গড়ে তুলে কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ✿ সময়মতো সরকারি সহায়ক মূল্য ঘোষণা ও সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদন সংগ্রহের সরকারি ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ ে(তমজুরের ন্যূনতম মজুরি ও ২৭০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা হবে।
- ✿ ভূমিসংস্কার ও সরকারের হাতে ধরে রাখা খাস জমির বন্টন করা হবে।
- ✿ অগভীর নলকূপ নির্ভর ভূগর্ভস্থ জলের সেচের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠ জলের সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
- ✿ অসম্পূর্ণ বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণ ও নতুন সরকারি সেচ প্রকল্প নেওয়া হবে।
- ✿ ভূমি ব্যবহারের সার্বিক নীতি, কৃষিজমির উর্বরতা র(া ও উর্বর কৃষিজমিকে কৃষি কাজে সংর(িত রাখা হবে।
- ✿ গ্রামীণ সড়ক যোজনার যথাযথ রূপায়ণে প্রত্যেক গ্রামে সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে।
- ✿ কৃষিপণ্যের বীমা ও কৃষি ঋণের ব্যবস্থা এবং সাধারণ কৃষিবীমার ব্যবস্থা করা হবে।
- ✿ বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাস্টার প্ল্যান, বন্দর পরিকল্পনার বন্দোবস্ত করা হবে।
- ✿ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ত্রাণ ও ফলন-বিপর্যয়ে উপযুক্ত((তিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।
- ✿ ফসল বৈচিত্র্য ও স্থানীয় বীজের ব্যবহার বাড়ানো হবে।
- ✿ রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো হবে।
- ✿ তথ্য প্রযুক্তি(র সুবিধা সহ বহুমুখী কৃষি সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- ✿ কৃষি প্রযুক্তি(ও কৃষি পণ্য প্রক্রি(য়াকরণের শি(ণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- ✿ বিকল্প সমবায়িক ব্যবস্থায় কৃৎকৌশল, উৎপাদন, পণ্যবাণিজ্য, মূলধন সরবরাহ ও সেচ সংগঠনকে সুসংহত করা হবে।
- ✿ প্রাণী সম্পদের বিকাশকে গু(ত্ব দেওয়া হবে।
- ✿ মাছের চাষ, তাঁত শিল্প, পোড়ামাটি, মাদুর, চি(নি শিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৎসজীবী, তন্তুবায় থেকে শু(করে অন্যান্য সকল (ুদ্র জীবিকার (ে ত্রে সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।
- ✿ জমির খাজনা, রেজিস্ট্রেশন ফী ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত ট্যাক্সের অযৌক্তি(ক ও অনৈতিক বোঝা এবং এই সংক্র(ান্ত হয়রানি দূর করা হবে।
- ✿ সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছনো হবে।

ভূমিসংস্কার

প্রায় ৬ কোটির কাছাকাছি পশ্চিমবঙ্গবাসী বাস করেন গাঁয়ে। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরেই সিপিআই(এম) ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে আসছে যে, ভূমিসংস্কার ও গ্রামোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশে রোলমডেল! এর চেয়ে বড় মিথ্যা বোধহয়, আর হতে পারে না।

দা(ণ সফল ওই ভূমিসংস্কারের ঠেলায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালে ৩২ ল(৭২ হাজার ভূমিহীন খেতমজুর ২০০১ সালে লাফিয়ে বেড়ে হল ৭৩ ল(৬২ হাজার ৯৫৭! গ্রামীণ মানুষের ভূমিহীনতা বৃদ্ধির এই জঘন্য নজির ভারতের আর কোনও রাজ্যে নেই। গ্রামোন্নয়ন ও ভূমিসংস্কারের অতুলনীয় সাফল্য দাবি করার পরেও বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪৫.৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে নিজস্ব জমি আছে, যেখানে ভারতে জাতীয় গড় ৫৮.৭ শতাংশ। আজও পশ্চিমবঙ্গবাসীর ৭২ শতাংশই চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল, অথচ এদের ৮০ শতাংশরই জমির পরিমাণ ০.৬৪ হেক্টরের নিচে। পশ্চিমবঙ্গ বাসীর ৫৪ শতাংশরই মাসিক রোজগার ১,৫০০ টাকারও কম। কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। ১৮ মিলিয়নের বেশি গ্রামীণ বাঙালি আজ দারিদ্রসীমার নিচে, কেবল বিহার-উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে তুলনীয়। গত তিন দশকের ভূমি সংস্কারের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে সরকার উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বন্টনের উদাহরণ দেন কিন্তু স্বীকার করতে ভুলে যান যে, ১৯৭৭ সালের পরবর্তী ২৬ বছরে বন্টিত জমির পরিমাণ, ১,৮৬,০২৯ হেক্টর, অথচ ১৯৭৭ সালের আগেই বন্টিত হয়েছে ২,৫৩,৫৫৬ হেক্টর। এখানেই শেষ নয়, বামফ্রন্ট যে পাট্টা জমি বিলি ও বর্গা নথিভুক্তি(র ে(ত্রে এতদিন অসামান্য সাফল্যের কথা প্রচার করে আসছে, সেটিই মুখ থুবড়ে পড়েছে 'উন্নততর বামফ্রন্ট' জমানাতেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানবোন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ অনুযায়ী পাট্টাদারদের ১৩.২৩ শতাংশ জমির অধিকার হারিয়েছেন ও বর্গাদারদের ১৪.৩৭ শতাংশ উচ্ছেদ হয়েছেন ইতিমধ্যেই। ১৯৮৭-৮৮ সালেও ভূমিহীন গ্রামীণ পরিবারের অনুপাত ছিল এখানে ৩৯.৬ শতাংশ, ভূমিসংস্কারের ঠেলায় তা ১৯৯৯-২০০০-এ দাঁড়িয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ! ভারত সরকারের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমী(া-৩-এ বেরিয়েছে যে, ভারতের গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে নিজের জমি আছে যেখানে ৫৮.৭ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাত মাত্র ৪৫.৭ শতাংশ। ৩২ বছরের বামশাসনের গুঁতোয় ২০০৯-এ গ্রামবাংলায় ৬০ শতাংশ পরিবারই আজ ভূমিহীন হয়ে পড়েছে, বললে বোধহয় অত্যুক্তি(হবে না।

সেজ

স্পেশাল ইকনমিক জোন বা 'সেজ' আইন গ্রহণ করা হয়েছে। যা দেশের আইন ও শ্রমনীতি বিরোধী এবং মৌলিক ভাবে জনস্বার্থ বিরোধী। কৃষির কর্পোরেটকরণের মাধ্যমে শু(হয়েছে কৃষির অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করে কোটি খুচরো ব্যবসায়ীকে পথে বসাবার নীতি। এরই সাথে যুক্ত(হয়েছে 'উন্নয়ন', 'নগরায়ন' ও 'শিল্পায়ন'-এর নামে বলপূর্বক উর্বর কৃষিজমি দখল করার সর্বনাশা কর্মকাণ্ড।

এসবের ফলে কার্যত, দারিদ্র-অনাহার ত্র(মশ বাড়ছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের টিকে থাকাই আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের ধনভাণ্ডার ত্র(মশ স্ফীত হচ্ছে।

গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নগরবাসীর অনুপাত ছিল ২৩.৮৯ শতাংশ, ৫০ বছর বাদে ২০০১ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ২৭.৯৭ শতাংশে। বিগত দশকে (১৯৯১-২০০১) শহরবাসীর অনুপাত তামিলনাড়ুতে বৃদ্ধি ১০ শতাংশ গুজরাট-

মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক-পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ওই বৃদ্ধি অন্তত ৩ থেকে ৪ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি মাত্র আধ শতাংশ। আরও পরিতাপের বিষয় যে ওই সময়ে নদীয়া-বীরভূম-বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দ(িণ দিনাজপুর জেলার শহরবাসীর অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। অথচ বুদ্ধ-সরকারের প্রচার যে পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ন ও শিল্পায়নে জোয়ার এসেছে ও আসছে।

৩২ বছর ধরে নগরোন্নয়নের গুঁতোয় আজও কলকাতাতেই আছেন গৃহহীন পথবাসী হিসাবে প্রায় ৬৮ হাজার নাগরিক। অন্তত ৫৮টি শহরের ২৫ শতাংশ আদিবাসীই বস্তিবাসী। শিল্পায়নের মডেল হলদিয়াতে আজও ৫২ শতাংশ পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। দুর্গাপুরের হালও তথৈবচ, সেখানে এই হার ৩৩ শতাংশ। রাজ্যে ২০টি শহরে অধিকাংশ নাগরিকই পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল পান না! শিলিগুড়ির ৬৭ শতাংশ, খড়্গপুরের ৫১ শতাংশ নাগরিক কুয়োর জল খান! খাস কলকাতায় ৭-১৪ বছর বয়সী শিশুদের উল্লেখযোগ্য অংশ স্কুলে পাঠরত নয়। ১ ল(৪২ হাজার নাগরিকের শহর বাঁশবেড়িয়াতে প্রশি(িত ডাক্ত(ারের সংখ্যা মোট ৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ইলগাসের দেওয়া তথ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে ৩২ বছরের নগরোন্নয়নের ফলে বঙ্গ বাসীর কপালে জোটা এই সব মণিমুক্ত(ার খবর।

গ্রামীণ ও বস্তি অঞ্চলের জন্য অর্থ ব্যবহারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেখিয়েছে সিপিএম সরকার। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য চিহ্নি(ত তহবিল অন্য তহবিলে স্থানান্তরিত করা যাবে না। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার নির্দিষ্টভাবে চিহ্নি(ত প্রকল্পের অর্থ অন্য তহবিলে স্থানান্তরিত করেছে। যে সমস্ত আধিকারিক রাজনৈতিক নির্দেশ মান্য করে এ কাজে লিপ্ত তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই।

চূড়ান্ত দলীয় রাজনীতিকরণের চাপে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজ আজ পুরোপুরি বিপর্যস্ত। গ্রামসমাজের নিজস্ব চরিত্র ও গতি প্রকৃতি হারিয়ে গেছে, এসেছে শুধুই রাজনৈতিক দলের শাসন। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই গ্রামসমাজের এই অদ্ভুত রূপান্তর দেখা যায়। শুধুমাত্র সরকারি (মতা ও রাজনৈতিক শক্তি(র আশ্রয়ে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ শাসক শ্রেণি যারা নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামসমাজের সবকিছুই। সাধারণ জীবিকা নির্বাহ থেকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, গ্রামোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে সরকারি অনুদানের বিলি বন্দোবস্ত, স্থানীয় প্রশাসন, সর্বত্রই আছে স্থানীয় সিপিএম নেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই রাজনৈতিক শ্রেণির মাতব্বরি।

গ্রামোন্নয়নে সাফল্য! ভারত সরকারের এই সমী(াতেই বেরিয়ে এসেছে যে, গ্রামীণ ভারতে যেখানে ৫৫.৭ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, আজও গ্রামবাংলায় ওই হার ৩৪.৯ শতাংশ। ভারতের গ্রামাঞ্চলে ২৭.৯ শতাংশ বাড়িতেই পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল যায়, সেখানে গ্রামবাংলায় ৯.৫ শতাংশ বাড়িতে এই সুযোগ। গোটা দেশে গ্রামগুলিতে ২৫.৫ শতাংশ পরিবারের পাকা কোঠা বাড়ি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে ১৮.২ শতাংশ! ভারত জুড়ে গ্রামগুলিতে অন্তত ১২.১ শতাংশ পরিবারের ন্যূনতম একটা মোটরসাইকেলও আছে, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়নের জোয়ার আনার স্বঘোষিত ভগীরথ বুদ্ধবাবুর জমানায় গ্রামবাংলায় ওই হার মাত্র ৫.৫ শতাংশ। দেশে ৩০.৯ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের টেলিভিশন আছে, প(ান্তরে তিনদশকের সিপিআই(এম) রাজত্বের পর পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৯.১ শতাংশ।

গত ৩২ বছরের বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজে এই বিশেষ শ্রেণি ত্র(মাগত পরিপুষ্ট হয়েছে সরকারি অর্থ নয়ছয় করে। ফলে মার খেয়েছে গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ ব্যবস্থা। এখন জানা গেছে যে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ গরিবের চাল-গম পাচারে এই বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে বরাদ্দ চালের ৬৭ শতাংশ ও গমের ৮৩ শতাংশই পাচার হয়ে যায় অন্যত্র, রাজ্যের গরিব মানুষের কপালে জোটে না (ও আর জি সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ)। বামফ্রন্টের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এর সূচকের হিসেবে দেখা যায় দেশের ১৫টি বড় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১২তম। গ্রামে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার সূচকের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৩৩ শতাংশ, যেখানে অন্যান্য রাজ্য, যেমন পাঞ্জাবে আছে ৮১, হরিয়ানায় ৭২, মহারাষ্ট্রে ৫৫ ও তামিলনাড়ুতে ৫৪ শতাংশ।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে হবে। চূড়ান্ত রাজনীতিকরণ ও রাজনৈতিক (মতার ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট শাসক শ্রেণির হুমকি, শাসানি, সামাজিক বয়কটের নাগপাশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজকে মুক্ত(করতে হবে। পুনর্গঠন করে সুস্থির করতে হবে গ্রামসমাজকে। উদ্দীপ্ত করতে হবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্রোতকে যা এতকাল অব(দ্ধ হয়েছে বামফ্রন্টের অপশাসনে। সামাজিক উদ্যোগের জোয়ার ছাড়া গ্রামোন্নয়ন কখনও সম্ভব হবে না। এই ল(্যে তৃণমূল কংগ্রেস তাই সার্বিক গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচিতে বিশেষভাবে গু(ত্ব দেবে নিম্নলিখিত দিকগুলিকে—

- ✿ তৃণমূল স্তর থেকে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা তৈরির জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে এবং এতে পরিকল্পনা কমিশনকে সামিল করতে হবে। পঞ্চায়েতী রাজ ও পৌর স্বায়ত্তশাসনকে আরও (মতাশীল, সত্রি(য়, গণমুখী, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত(করতে হবে।
- ✿ গ্রামীণ ও বস্তি অঞ্চলের জন্য অর্থ ব্যবহারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেখিয়েছে সিপিএম সরকার। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য চিহ্নি(ত তহবিল অন্য তহবিলে স্থানান্তরিত করা যাবে না। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট চিহ্নি(ত প্রকল্পের অর্থ অন্য তহবিলে স্থানান্তরিত করেছে। যে সমস্ত আধিকারিক রাজনৈতিক নির্দেশ মান্য করে এ কাজে লিপ্ত তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই।
- ✿ দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন ও নগরায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে ও পরিবেশ দূষিত না হয়।
- ✿ সর্বগ্রাসী দলীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত(করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে গ্রামের স্বায়ত্তশাসনে সর্বোচ্চ (মতায় গ্রাম সংসদের প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার সদস্য হবে গ্রামের প্রতিটি পরিবার।
- ✿ জেলা উন্নয়নের একত্রিত খাতে (ইউনিট ফান্ড) ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।
- ✿ গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলির যথাযথ ও স্বচ্ছ রূপায়ণ করা হবে।
- ✿ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ও গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগের ১০০ শতাংশ রূপায়ণ করা হবে।
- ✿ ইন্দিরা আবাস যোজনা ও অন্যান্য যোজনার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে স্বল্প ব্যায়ের বাসস্থান, পানীয় জল ও শৌচ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

- ✿ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শি(ার ব্যাপ্তি ঘটানো হবে।
- ✿ যথার্থ অরাজনৈতিক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও সমবায় আন্দোলনের বিকাশ করা হবে।
- ✿ গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষেবা (ে ত্রের বিকাশ ঘটানো হবে।
- ✿ কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।
- ✿ বছরে ৯০ দিনের কাজ ছাড়াও স্টেট এমপ্-য়মেন্ট অ্যাসুরেন্স স্কিম যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা করা হবে।
- ✿ BPL কার্ড ঠিকমতো দেওয়া হবে।
- ✿ ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা হবে।

কর্মহীন শ্রমিক ও উন্নয়ন

স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের স্রোতে পুরনো শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়, নতুন শিল্পসংস্থাও সৃষ্টি হয়। সত্যিকারের উন্নয়ন তখনই ঘটে, যখন নতুন শিল্পসংস্থার প্রতিষ্ঠা (গ্ন শিল্পসংস্থার সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। এই প্রত্রি(য়ায় কর্মসংস্থানের সমস্যা এলেও তা হয় সাময়িক, (ণস্থায়ী। পশ্চিমবঙ্গের (ে ত্রে চিত্রটি তা নয়। বামফ্রন্টের অপশাসনে কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে অনেক, আর সেই তুলনায় নতুন সৃষ্টি হয়নি প্রায় কিছুই। ফলে রাজ্যে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

অসংখ্য ছাঁটাই শ্রমিকের ক(ণ দুর্দশার চিত্রটি শুধু এক মানবিক সমস্যা নয় তার আরও গু(তর দিক আছে। আর্থসামাজিক প্রে(িতে বৈষম্যের ত্র(মবর্ধমান টানাপোড়েনে সৃষ্টি হয়েছে রাজ্য জুড়ে এক অদ্ভুত অস্থিরতা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'উন্নয়ন ও শিল্পায়নের' চটক ও প্রচারসর্বস্বতার নীচে সৃষ্টি হয়েছে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি।

কর্মহীন ছাঁটাই শ্রমিক ছাড়াও সৃষ্টি হয়েছে বিশাল আকারে উন্নয়ন-উদ্বাস্তু। বি(্বায়নের ফলে উন্নয়ন-উদ্বাস্তুর সৃষ্টি এক নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে সব উন্নয়নশীল দেশেই। তাই কোনও দায়িত্বশীল সরকার শুধুই উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন-উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধেও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা এই বামফ্রন্টের ভাবনা-চিন্তায় স্থান পায়নি। বরং দেখা যায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার মানবিকতার খাতিরেও ছাঁটাই শ্রমিক ও উন্নয়ন-উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনে দৃষ্টিপাত করতে নারাজ। আইন অনুযায়ী যে ন্যূনতম ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা আছে তাও প্রতিপালিত হয় না বামফ্রন্টের অপশাসনে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির টাকা পান না ছাঁটাই শ্রমিক। বহু শিল্প সংস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নয়ছয় হয়েছে ও বকেয়া পড়ে আছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ছাঁটাই শ্রমিকরা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা ভাতা পাবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি যথাযথভাবে—অনেকেই কিছুই পাননি, আর অল্পসংখ্যক যারা পেয়েছেন তাদের কপালেও জুটেছে মাঝে মধ্যে, তিন-চার মাস পরে।

কর্মহীন শ্রমিক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যেখানে গু(ত্ব পাবে—

- ✿ পি এফ গ্র্যাচুইটি, ই এস আই সংত্র(ান্ত শ্রম-আইনগুলির যথাযথ ও পূর্ণ রূপায়ণ।
- ✿ বাজার মূল্য মাথায় রেখে কর্মহীন ছাঁটাই শ্রমিকদের ভাতার যথাযথ ব্যবস্থা করা।

উন্নয়ন - উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন

উন্নয়ন-উদ্বাস্তু সমস্যার দিকে নজর রেখে যে কোনও উন্নয়ন প্রকল্পে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ব্যয়-বরাদ্দ রাখা আজকাল বাধ্যতামূলক শর্ত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে যা ঋণ বা অনুদান আসে তার মধ্যে পুনর্বাসনের খরচও দেওয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই পুনর্বাসন আর বাস্তবে ঘটে না—সব টাকাই চলে যায় ঠিকেদারদের সঙ্গে যোগসাজশে স্থানীয় সিপিএম নেতাদের পেট ভরাতে।

পশ্চিমবঙ্গে ছাঁটাই কর্মহীন শ্রমিক ও উন্নয়ন-উদ্বাস্তুর বিশাল আকার যে ভয়াবহ অবস্থা ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ আজ একান্ত জ(রি। তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়ন-উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করবে, যেখানে গু(ত্ব পাবে—

- ✿ যারা ১৯৭১ সালের আগে এসেছে তাদের (ে ত্রে চাকুরি বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের (ে ত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার সমাধান করা। এদের (ে ত্রে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করা।
- ✿ জোর করে বাস্তুচ্যুত করা যাবে না।
- ✿ প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা।
- ✿ অসংগঠিত (ে ত্রগুলি থেক অনাবশ্যক ও পুনর্বাসনহীন উচ্ছেদ বন্ধ রাখা।
- ✿ একটি সার্বিক পুনর্বাসন তহবিল গঠন করা ও তার যথাযথ ব্যবহার করা।
- ✿ উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরকে উপযুক্ত(গু(ত্ব দিয়ে দেখা।

বেকার সমস্যা - স্বনিযুক্তি(ও অসংগঠিত (ে ত্রের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে জানা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার ল(ল(জনগণের টাকা খরচ করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তার মধ্যে মূলত দূরদর্শন, রাস্তার ধারের হোর্ডিং, ব্যানার ইত্যাদি অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার (মতায় আসার সময় নথিভুক্ত(বেকার সংখ্যা ছিল ১২ ল(, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ ল(। তার মধ্যে শি(িত (মাধ্যমিক ও তার ঊর্ধ্ব) বেকার অর্ধেকেরও বেশি। এই সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে ওপরের দিকে স্থান করে নিয়েছে। এ তো গেল শুধু নথিভুক্ত(বেকার সংখ্যা। নথিভুক্ত(নয় এমন বেকার সংখ্যার হিসেব আমাদের জানা নেই। শি(িত বেকার রয়েছেন ৩৪ ল(। গ্রামে বেকারের সংখ্যা ৩১.২৭ ল(। সব থেকে আশঙ্কাজনক হল পশ্চিমবঙ্গে বেকারির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৯ শতাংশে। ভারতবর্ষের শতকরা হিসেবে যা ৫.৯১ শতাংশ। 'উন্নততর বামফ্রন্ট' (ে-াগান নিয়ে জিতে আসা ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের এই হচ্ছে যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের হার। আর এখন 'চটক' হিসেবে (ে-াগান হল 'উন্নততর পশ্চিমবঙ্গ'। আমাদের অন্যতম সংকল্প ''বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান''। তাই আমরা বলি ''বেকারত্ব হঠাও, জীবন বাঁচাও।''

বামফ্রন্ট সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিগত বছরগুলিতে কী করেছে? ৮০,০০০ সরকারি পদ এই সরকার শূন্য রেখেছে। ৭২,০০০ প্রাথমিক শি(কের নিয়োগ অনিশ্চিত করেছে। এভাবেই খালি করে রেখেছে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালের বহু পদ। শুধুমাত্র আর্থিক সংকটই যে এর কারণ তা ন্যায়। আসলে সিপিএম নিজেদের ক্যাডারবাহিনী থেকে 'আমাদের লোক' ছাড়া আর কারও কর্মসংস্থান করতে নারাজ। সরকারের টাকার অভাব হয় না 'বিজ্ঞাপন' সংক্র(ান্ত কাজে বা মন্ত্রী, নেতাদের জীবনযাপনকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নততর করতে। নির্বাচনের আগে তাহলে তারা কীভাবে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করছে জনগণকে! এখন কি আর্থিক সংকট আর নেই?

বন্ধ শিল্পের কারণে ১৫ ল(লোক ছাঁটাই হয়েছে। ফলে অনাহার মৃত্যুকে বরণ করেছে অনেকে। বামফ্রন্ট সরকার কখনও কখনও কোনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি এই অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের দিকে। উত্তরবঙ্গের চা বাগানের না খেতে পাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা লোকজনের জন্য ব্যবস্থা করেনি কোনও সরকারি সাহায্যের। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র যাদপপুর-এ বন্ধ হয়ে যাওয়া সুলেখা ফ্যাক্টরির শ্রমিকরাও না খেতে পেয়ে আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছে। প্রায় ৮০,০০০ সরকারি কর্মী বেসরকারিকরণের কারণে হারাতে বসেছে তাদের চাকরি।

শ্রমিকদের বড় অংশের কর্মসংস্থান হল (ুদ্র শিল্প সংস্থায়। প্রায় দেড় ল(সংস্থা (দেশের সাতচল্লিশ শতাংশ) বন্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য অধিকাংশ (ে ত্রে সিপিএম-এর স্থানীয় চক্র(ই দায়ী। এই শিল্পগুলিকে র(া করতে কখনওই বামপন্থী সরকার এগিয়ে আসেনি, বাড়ায়নি সাহায্যের হাত। প্রচারসর্বস্ব বামফ্রন্ট সরকার তোতাপাখির মতো স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বেকার যুবকদের মুখেই উৎসাহ দিয়ে গেছে। নিজেদের পছন্দসই লোক ছাড়া কাউকেই এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দান করেনি এই সরকার।

শহরের কর্মসংস্থানের জন্য 'শহরি রোজগার যোজনায়' কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তাও সঠিকভাবে কার্যকরী করেনি বামফ্রন্ট সরকার। একই ভাবে অকৃতকার্য হয়েছে সম্পূর্ণ রোজগার যোজনা, গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির জন্য।

'বাংলার মুখ' এর মতো কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তি(গত প্রকল্প অসফল হয়েছে। বাম জমানায় গ্রাম এবং শহর সর্বত্রই কর্মসংস্থান স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে কম। ১৯৮০ সালে সংগঠিত (ে ত্রে কর্মসংস্থান ছিল ২৬.৬৪ আর ২০০৪ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ২২.৩০ লাখ। এই কি তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের সব থেকে বড় অর্জন! তথ্যপ্রযুক্তি(র যথাযথ রূপায়ণ না হলে শুধুমাত্র শিলান্যাস আর যুব সম্প্রদায়ের জন্য অনেক অনেক কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি আজ জনমানসে 'হাওয়ার ফানুস'-এর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি(এবং পরিকাঠামো তৈরির নামে প্রমোটারির ব্যবসা সামলাতে গিয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের দিকে দৃষ্টিপাতও করেনি এই সিপিএম পরিচালিত সরকার। এই পাপের বোঝা আর সাংস্কৃতিক উন্নয়নশীল মুখ্যমন্ত্রী কত বাড়াবেন সে ব্যাপারে ভেবেছেন কি?

অসংগঠিত (ে ত্রেও এই একই হাল, এখানেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা মূক ও বধিরের মতোই। সমকালীন উন্নয়ন ও শিল্পায়নে সংগঠিত (ে ত্রের পাশাপাশি অসংগঠিত (ে ত্রেরও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সে বিষয়ে বামফ্রন্ট তাত্ত্বিক নেতারা একেবারেই

অবহিত নন। অসংগঠিত ে ত্রের বিকাশের সঠিক দিকে বাহিত করা ও তার কর্মকাণ্ডের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করা আজ অত্যন্ত জ(রি। নিয়ন্ত্রণ মানে উচ্ছেদ নয়। এই বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রণের নামে উচ্ছেদ করে ধ্বংস করছে অসংগঠিত ে ত্রকে— বস্তি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ, স্থানীয় বাজার উচ্ছেদে বিপন্ন হয়েছে (জি-রোজগার হারানো লাখ লাখ মানুষ ও তাদের পরিবার। স্থানীয় বাজারগুলিকে ভেঙে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করছে বৃহৎ শপিং মলের ব্যবসা। হকার, খাদ্য সামগ্রী বিত্রে(তা, কুলি, ে দ্র ব্যবসায়ী, পণ্য পরিবহন, সেলসে কর্মরত মানুষ, ছুতোর, দরজি, কল সারানোর মিস্ত্রি, জুতো তৈরির শ্রমিক, যৌনকর্মী ইত্যাদিদের জন্যও সরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। নেই কোনও সাহায্যের প্রয়াসও। এদের কাজকে আরও উন্নত করার জন্য এই ২৯ বছরে জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র মিটিং মিছিলে বলপূর্বক এঁদের যোগদান ভিন্ন এদের কর্মসংস্থানকে আর একটু উন্নতির মুখ দেখাতে কোনও সরকারি ঋণ বা অনুদান বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ভেবেও দেখেনি। এটা শুধুমাত্র সরকারের আর্থিক অসুবিধার কারণ নয়, যথেষ্ট সদিচ্ছার অভাবকেই প্রকট করেছে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রাম ও শহরভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য নানান খাতে সাহায্য পাওয়া যায়, সেখানেও শুধু রাজনীতিকরণ ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য সিপিএম পরিচালিত সরকার তার যথাযথ ব্যবহার করেনি। শুধু লুটেপুটে খেয়ে নিয়েছে সরকারি অর্থ।

যারা উচ্চশি(ার সুযোগ পায় তারা চলে যায় বিদেশে। দেশের কাজে আমরা তাদের ধরে রাখতে পারি না। সেরকম কোনও ব্যবস্থা এরাজ্যে নেই। আবার উচ্চ শি(ার সুযোগ যারা পায় না তারাও দিল্লি, মুম্বাই, রাজস্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়। ল(ল(জন। কেউ সোনার কাজ করে, কেউবা পাথর কাটে। আর যেভাবে সেখানে তাদের থাকতে হয় সেটা মানুষের জীবন নয়।

ভারতের প্রতি পরিবার থেকে অন্তত একজন স(ম প্রাপ্তবয়স্কের ন্যূনতম কমসংস্থানের উদ্যোগ রাষ্ট্রকে নিতে হবে। 'কাজের অধিকার'কে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস সত্রি(য় থাকবে।

তৃণমূল কংগ্রেস এই জ্বলন্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখে কর্মসংস্থানের জন্য যে সব সুনির্দিষ্ট পদ(প গ্রহণ করতে চায়, সেগুলি হল—

- ✿ ে দ্র ও মাঝারি শ্রমনিবিড় শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা।
- ✿ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, স্কুল, কলেজ, হসপিটাল এবং আধা-সরকারি সংস্থাগুলির শূন্যপদ পূরণ করা।
- ✿ স্বনির্ভর এবং ে দ্র শিল্পগুলিকে সমবায়িক ব্যবস্থার সাহায্য দেওয়া।
- ✿ যথার্থ অরাজনৈতিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান তৈরি করা।
- ✿ কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির স্বচ্ছ ও পূর্ণ রূপায়ণ।
- ✿ মৃতপ্রায় ে দ্র শিল্পগুলিকে পুন(জ্জীবিত করা শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে।
- ✿ নানা ধরনের স্বনিযুক্তি(র প্রয়োজনীয় কর্মশি(ার ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির জন্য 'সীড মানি লোন' এর ব্যবস্থা করা।
- ✿ বেকার ও অসংগঠিত ে ত্রের কর্মীদের যেমন, হকার, সবজি ও খাদ্যবিত্রে(তা, ঠেলাচালক, রিক্সাচালক, দিনমজুর, ঠিকাশ্রমিক, গৃহপরিচারক বা পরিচারিকা,

যারা কোনও সরকারি সুযোগ পান না, তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সামাজিক সুর(ার বিশেষ পরিকল্পনা।

- ✿ যৌনকর্মীদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য, শি(া এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা-সহ সামাজিক সুর(া বলয়ে আনতে হবে।
- ✿ সেলসে কর্মরত কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা সহ সামাজিক সুর(া বলয়ে আনতে হবে অর্থাৎ সেলস্ প্রোমোশনে নিযুক্ত(কর্মচারীদের সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকের মর্যাদা দিতে হবে।

দারিদ্র দূরীকরণ

রাজ্যের ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। যার বেশিরভাগটাই গ্রামীণ মানুষ। বিপিএল কার্ড নিয়ে চরম অবহেলা চলছে। শি(া, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার নির্মাণ, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, শিশুশি(া, মিড-ডে মিল, গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রভৃতি সামাজিক ও বস্তুগত পরিকাঠামো নির্মাণের ে ত্রে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

২২ অক্টোবর, ২০০৮ পার্লামেন্ট কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন ভারতের ২০০৫-এ ২৮.৩ শতাংশ গ্রামীণ দারিদ্রসীমার নিচে। ভারতে গরিবী রেখা স্থির হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে। গাঁয়ে ২৪০০ ক্যালোরি ও শহরে ২১০০ ক্যালোরি লাগে বাঁচতে একজন মানুষের। যে পরিমাণ টাকা ওই ক্যালোরির যোগান দেওয়া খাদ্য কিনতে পারে সেটাই দারিদ্ররেখা। ২০০৪-০৫ সালে নির্ধারিত গ্রামীণ দারিদ্ররেখা হচ্ছে মাথাপিছু মাসিক ৩৫৬.৩০ টাকা। এর নিচে আয় করা প্রত্যেকেই দারিদ্রসীমার নিচে। বা দিন ১২ টাকা রোজগার করতে না পারা মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে। তিন দশক সিপিআই(এম) রাজত্ব চলার পরে গ্রামবাংলায় দৈনিক ১২ টাকা রোজগার করতে না পারা মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৩ ল(২২ হাজার মানুষে! বা জনসংখ্যার ২৮.৬ শতাংশ গড় ভারতের চেয়েও বেশি! আর গাঁ ও শহর মিলিয়ে ২ কোটি ৮ ল(৩৬ হাজার পশ্চিমবঙ্গবাসী সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী দারিদ্রসীমার নিচে! ৩৪ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে খারাপ অবস্থা কেরল, ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও দাদরা-নগর হাভেলিতে। সামাজিক উন্নয়নের ল(্যে বিভিন্ন রাজ্যসরকার খরচ করে স্বাস্থ্য-শি(া-গণবন্টন প্রভৃতি খাতে। Social Services খাতে পশ্চিমবঙ্গের ে ত্রে মাথাপিছু খরচ কমেই চলেছে। জ্যোতি বসুর বিদায় বেলায় ১৯৯৯-২০০০-এ ছিল ৬৭৫ টাকা! বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই অকিঞ্চিৎকর খরচকেও নামিয়ে আনলেন ২০০৬-২০০৭-এ ৫৬৯ টাকায়! বামসরকার রতন টাটাকে ১ শতাংশ সুদে ২০০ কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়েছেন। অথচ সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী! পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উৎপাদনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের দেনার অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২০০৪-০৫-এ ৫০.৮ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭-এ সামান্য নেমে হয়েছে ৪৭.২ শতাংশ! ২০০৮ অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছে The India State Hunger Index-এতে দেখা যাচ্ছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কথা দূর স্থান, নাইজিরিয়া, কঙ্গো, মিয়ামার, পাকিস্তান, ঘানা, লিবিয়ার মতো অনুন্নত রাষ্ট্রের চেয়েও ে ধার প্রাবল্য পশ্চিমবঙ্গে বেশি! তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ থেকে ে ধার এই নরক যন্ত্রণা দূর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ৩২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গকে

লুটেপুটে যারা শ্মশান বানিয়েছে, সেই প্রেতশক্তি(কে বাংলার মসনদ থেকে হঠাতে তৃণমূল কংগ্রেস বদ্ধপরিকর। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে প্রতিটি বঙ্গবাসীর আঁখিকোণ থেকে অশ্রুবিন্দু তৃণমূল কংগ্রেস মুছবেই।

- ✿ সময়োপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করে সার্বিক স্বচ্ছতার মাধ্যমে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত মানুষজনকে চিহ্নি(ত করে প্রকৃত বিপিএল তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং এদেরকে দারিদ্র সীমার ওপরে তুলে আনার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ✿ দারিদ্র দূরীকরণের প্রত্যেকটি প্রকল্পের স্বচ্ছ ও পূর্ণ রূপায়ণ, বি পি এল তালিকার সর্বসমক্ষে প্রকাশ ও প্রদর্শন।

তৃণমূল কংগ্রেস দারিদ্র দূরীকরণে বিশেষভাবে গু(ত্ব দেবে—

- ✿ দারিদ্র সীমার নীচে এদের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। শি(া ও স্বাস্থ্যর ব্যবস্থা করা।
- ✿ এদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা।
- ✿ এই শ্রেণীর যুব সমাজকে স্বনির্ভর করার জন্য সাহায্য হিসেবে বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।
- ✿ এদের স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিসহ সমস্ত ধর্মীয় আচরণবিধিকে সুর(া প্রদান করা।
- ✿ এদের শি(ার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল তৈরি করা।
- ✿ দরিদ্র সম্প্রদায়ের শি(া, চাকরি ইত্যাদির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হয়ে এদের উন্নতিকরণ প্রক্রি(য়াকে ত্বরান্বিত করা।

সংখ্যালঘু, তপশিলী জাতি - জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি

✿ **সাচার কমিটির রিপোর্টে** প্রমাণিত হয়েছে এরাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকাংশই চরম দারিদ্র, শি(াহীনতা ও অনগ্রসরতার শিকার। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থাও অথৈবচ। শি(া ও কমসংস্থানের ক্ষেত্রে আইনি ও সাংবিধানিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই বিপুল সংখ্যক মানুষ। সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নেটিও গভীরভাবে ভাবাচ্ছে তাদের। এইসব পশ্চাদপদ অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের উন্নয়নের প্রশ্নে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরিতে ১৯৪৭-এর অব্যবহিত পরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা ১৭ ভাগ। সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলেও এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৯ ভাগ। তারপর থেকে এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমতে কমতে সিপিআই(এম) শাসনে নেমে এসেছে শতকরা ২ ভাগেরও নিচে। উচ্চ শি(ায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শতকরা এক ভাগেরও কম। অথচ সংখ্যালঘু শি(া প্রতিষ্ঠানগুলিতে (মাদ্রাসা বা মিশনারি শি(া প্রতিষ্ঠানে) দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা চলছে লাগাতারভাবে।

আমাদের রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সাচার কমিটির রিপোর্টে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এ রাজ্যের সিপিএম শাসিত বামফ্রন্ট শুধু মাত্র ভোটের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে কিন্তু তাদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য কোনও

ব্যবস্থাই নেয় না। তারা এই রাজ্যে দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় আর্থিক, সামাজিক, শি(া প্রায় সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিতদের দলে, একথার স্বীকৃতিও মেলে মানব উন্নয়ন রিপোর্টে, সাচার কমিটির রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই অবহেলা দূরীকরণে 'বিশেষ আর্থিক তহবিল' গঠন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সাচার কমিটি সহ অন্যান্য কমিটি কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে এবং তপশিলী জাতি-জনজাতি-আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের সরকারকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ হলেও সংখ্যালঘুদের সরকারি চাকরির সুযোগ শুধুমাত্র দু'শতাংশের কাছাকাছি। সংখ্যালঘুদের জীবনে ৩২ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে চলেছে শুধু বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন আছে। সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তা, সুর(া ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া। চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের, মেয়েদের ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রাধিকার বিশেষ গু(ত্ব পাবে ও কর্মসংস্থানও সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে।

মাদ্রাসা শি(ার জন্য মাদ্রাসা শি(ার উন্নয়ন, আধুনিক শি(ার ব্যবস্থা, মাদ্রাসা শি(া ব্যবস্থাতেও সরকারি অনুদান, উর্দু স্কুল ও উর্দু কলেজ তৈরি করবার ব্যবস্থা ও উর্দু ভাষার মানোন্নয়ন করতে হবে।

উর্দুভাষী মানুষ যে সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যাধিক্য (অন্তত ১০ শতাংশ) সেই সব অঞ্চলে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

ওয়াকফ প্রপার্টিতে যে বেআইনি দখলের কাজ হয়েছে তার তদন্ত করা ও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বেরিয়াল গ্রাউন্ড বা কবর স্থানের সংস্কার করা দরকার।

নতুন মাদ্রাসা চালু করা দরকার। সংগঠিত মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিমদের জন্য আলিগড় ইউনিভার্সিটির অনুকরণে বি(বিদ্যালয় হওয়া উচিত। মুসলিমদের উচ্চশি(ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মুসলিম মেয়েদের হোস্টেল / বোর্ডিং চালু করা দরকার।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত। তাদের সোশ্যাল সিকিওরিটির ব্যবস্থা করা দরকার। সংখ্যালঘুদের চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবি রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস।

✿ সংবিধান গ্রহণের পর প্রায় ছয় দশক কাটতে চলল। অথচ, সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) মানুষের জীবনমানের কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সর্বশেষ মানবোন্নয়ন রিপোর্টে বাধ্য হয়ে বলেছেন— সবচেয়ে বড় প্রতিফলন ঘটেছে গ্রামীণ ভূমিহীনতার ক্ষেত্রে। যদিও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বাসীর মধ্যে তপশিলী জাতি-জনজাতির মানুষ হচ্ছেন ২৮.৫ শতাংশ কিন্তু গ্রামবাংলার প্রায় ৭৩.৬৩ ল(ভূমিহীন খেতমজুরের ৫২.৪৬ শতাংশ বা ৩৮ ল(৬৩ হাজার ৯৫০ জনই হচ্ছেন তপশিলী জাতি-জনজাতি ভুক্ত(। ২৫.২ শতাংশ বঙ্গবাসী হচ্ছেন ইসলাম

ধর্মাবলম্বী, আবার ভূমিহীন খেতমজুরের ২৪ শতাংশ বা ১৭ ল(৭০হাজার ১২৩ জনই তারাই! অর্থাৎ দুবেলা দুমুঠো খাবার না পাওয়া এবং নামমাত্র মজুরিতে অন্যের জমিতে খাটা ভূমিহীন খেতমজুরের ৭৬ শতাংশই হচ্ছেন এসসি-এসটি ও মুসলমান। কিন্তু সামগ্রিক জনসংখ্যার যারা ৪৬.৩ শতাংশ সেই অন্যরা ভূমিহীনদের মাত্র ২৩.৫৪ শতাংশ! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তপশিলী আদিবাসী ও OBC-দের সার্টিফিকেট দিতে হবে।

প্রথমে আদিবাসীদের দুঃসহ অবস্থার কথা বলা যাক। ২০০১ সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী ৫.৫০ শতাংশ বা, ৪৪,০৬,৭৯৪ জন। পশ্চিমবঙ্গে স্বা(রতার হার ২০০১ সালে ৬৯ শতাংশ, কিন্তু আদিবাসীদের মাত্র ৪৩ শতাংশ স্বা(র। ২০০৩-০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করতেন ৭.৩৬ ল(ছাত্রছাত্রী, এদের মধ্যে আদিবাসী ২.১০ শতাংশ মাত্র। ওই বছরই ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভে পাঠরত ১ কোটি ৬৩ ল(৮১ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আদিবাসীরা ছিলেন ৪.৮৭ শতাংশ যা তাদের জন-অনুপাতের চেয়ে কম! অথচ জনসংখ্যার ৫.৫০ শতাংশ আদিবাসী হলেও পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে আদিবাসীদের হার ১৫.৫৩ শতাংশ। এর পরেও লালগড় ঘটবে না?

তপশিলী জাতি ও আদিবাসী জনগণ এ রাজ্যে চরম বৈষম্যের শিকার। রাজ্যে ২৮ শতাংশ সংর(ণ ঘোষিত হলেও সরকারি (ত্রে তপশিলীরা মাত্র ১২ শতাংশ চাকরিতে নিযুক্ত(। যার বেশির ভাগটাই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরিতে তপশিলীদের প্রতিনিধিত্ব ৫ শতাংশেরও কম। এই বর্গের মধ্যে আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা আরও বেশি। বাঁকুড়া,পু(লিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, চা-বাগানের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পশ্চাদপদতা লজ্জাজনক। আদিবাসী সমাজ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শি(া-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান-ভাষা-স্বীকৃতি সহ নানা দিক থেকেই বঞ্চিত। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের তালিকায় এরাজ্যে রয়েছে ৬৬টি ছোট ছোট বর্ণ সম্প্রদায়। ওবিসি-র অন্তর্গত হওয়ার (ত্রে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের দাবি এখনও গ্রাহ্য হয়নি। এরাজ্যে ওবিসি অন্তর্গত মানুষের জন্য ২৭ শতাংশের বদলে ৭ শতাংশ সংর(ণ চালু করা হয়েছে।

এককথায় বলা যায়, এ রাজ্যে সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের সমান অধিকার ও সম উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যায়নি। বিভিন্ন সরকারি ও সংসদীয় রিপোর্ট তার সা(ী দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ২৯ শতাংশ তপশিলী জাতি ও জনজাতিভুক্ত(। ২৮.৬ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি সম্প্রদায় মিলে হয়ে দাঁড়ায় জনসংখ্যার ষাট শতাংশ। এই তথ্য যথেষ্ট ইঙ্গিত বহনকারী। দারিদ্র ঘিরে রেখেছে এই সম্প্রদায়ের সিংহভাগ অংশকে। বিশেষত গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্রের এই প্রসার তিরিশ বছরের বাম রাজত্বের লজ্জা। বাম শাসনে এই তিনটি সম্প্রদায় সহ অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষরা শি(া, স্বাস্থ্য সহ বেচে থাকার ন্যূনতম শর্তগুলো থেকে এতটাই বঞ্চিত এবং সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলো থেকে এতখানি পিছিয়ে আছে যা তা বাম অপশাসনের নির্লজ্জতাকেই চিহ্নি(ত করে।

ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশন তপশিলী ও জনজাতি উন্নয়নের জন্য রাজ্য বাজেটের আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করেছে। এর রূপায়ণে এই রাজ্যের সরকার যে ব্যর্থতা,

বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকেই টের পাওয়া যায়। বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ রাজ্য সরকার তপশিলীজাতি ও জনজাতিদের জন্য ব্যয় করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের (ত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাজ্য সরকার তিনটি সম্প্রদায় ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের (ত্রে এতখানিই উদাসীনতা দেখিয়েছে এই তিরিশ বছরে যা তাদের স্বৈরাচারের অন্যতম চিহ্(হিসাবে বেশ করা যায়। সমস্ত দিক থেকে যা বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতাকে আরও বেশি প্রমাণ করে। এদের উন্নয়নের জন্য এতগুলো বছরে এই সরকার কোনও সুনির্দিষ্ট পদ(প গ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায় আগামী দিনগুলোতে এদের উন্নয়নের জন্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট পদ(প গ্রহণ করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু, তপশিলী জাতি ও জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে বিশেষভাবে গু(ত্ব দেবে।

রাজ্যের অন্য অংশের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এই অঞ্চল (বাঁকুড়া, পু(লিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমানের কিয়দংশ এবং বীরভূম) যেখানে মোট অঞ্চলের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ হচ্ছে তপশিলী, উপজাতি সম্প্রদায় - আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত(। এই অঞ্চলের মানুষদের আর্থিক/সামাজিক উন্নয়নে 'বহুমুখী আর্থিক প্যাকেজ'র ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। ৩২ বছরের সিপিএম শাসিত সরকার এদের শি(া, কর্মসংস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, চিকিৎসা, সেচযুক্ত(কৃষিজমি ব্যবহার, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিদ্যালয় স্থাপন কোনও (ত্রেই কাজ না করার ফলে জমা (োভ আজ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষদের মানবিক শর্তে আর্থিক সহায়তায় সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

মতুয়া, নমঃশুদ্র, রাজবংশী সহ জাতিগতভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

তপশিলী জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অঞ্চলে বিশেষ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে হবে।

বাংলাভাষার উন্নয়ন সহ উর্দু, অলচিকি, সাঁওতালি, মৈথিলি, ভোজপুরি, গু(মুখী, হিন্দী সহ সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার উন্নয়নের ল(্যে ভাষা অ্যাকাডেমি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

ভারত সরকারের সংর(ণ আইনকে সঠিক ভাবে রূপায়ণ করা হবে।

সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প এদের জনসংখ্যার সঙ্গে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট গু(ত্ব দেওয়া হবে।

অনগ্রসর শ্রেণীর সংর(ণের ব্যবস্থা থাকলেও তা কখনও কার্যে রূপায়িত হয়নি। অনেক খালি পদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ হয়নি। এই কাজগুলির রূপায়ণে গু(ত্ব দেওয়া হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় তপশিলী জাতি ও জনজাতির পরিচয়পত্র পেতে। ঠিক সময়ে সার্টিফিকেট পেতে দিনের পর দিন এইসব অসহায় মানুষদের অবহেলা করা হয়। তাই এই দলের সিদ্ধান্ত হল জেলায় জেলায় এর জন্য বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করে এক মাসের মধ্যেই অনুসন্ধান করে যথার্থ পরিচয় পত্র দেবার ব্যবস্থা করা।

মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্যে অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত(দের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হলেও পশ্চিমবাংলায় এখনও অনেকগুলো সম্প্রদায়কে

এর মধ্যে অর্ন্তভুক্তি(না করার ফলে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ব্যাপারেও বিশেষ কেন্দ্র তৈরি করে ৬ মাসের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর বিশেষ অনুদান ও সহায়তার জন্য রাজ্য কমিশনকে ব্লকস্তর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে এগুলির কার্যকারিতা ও মানুষের উপকার সহজ ও সুগম হয়।

পিটিটিআই ও পার্শ্বশি(ক-এর সমস্যা

✿ শি(া(ত্রে সিপিএম সরকারের আর এক অপদার্থতার জ্বলন্ত উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শি(ক শি(ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শি(াপ্রাপ্ত প্রায় ৭৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে অন্ধকার ডেকে আনা। রাজ্য সরকার এন সি টি ই-নির্দেশ, নিয়ম অবজ্ঞা করার ফলে রাজ্যের ১৩৮টি পি টি টি আই (প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট) কলকাতা হাইকোর্ট অবৈধ বলে ঘোষণা করে। যার ফলে ১৯৯৫ থেকে ওই সমস্ত শি(া প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক শি(ায় প্রশি(িত ছাত্রছাত্রীদের সংশাপত্র অবৈধ বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর তার ফল হিসেবে ১৯৯৫ থেকে ২০০৫-০৬ বর্ষ পর্যন্ত ৭৬ হাজার ছাত্রছাত্রী চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রসঙ্গত এই ৭৬ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করছেন আর ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী পাশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির সন্ধানে বসে আছেন। বাকি ১৬ হাজারের কোর্স এখনও শেষ হয়নি। এই ১৩৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৫টি প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকার নিজেই চালান, ১৬টি সরকারের সাহায্যে চলে আর ৫টি সরকার নিজেই অধিগ্রহণ করেছেন। বাদবাকিগুলি বেসরকারিভাবে রাজ্য সরকারের অনুমোদনে চলছে। রাজ্য সরকারের সিপিএম-সহ বিভিন্ন শরিক দলের মন্ত্রীরা বা জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের আত্মীয়রা এই ধরনের শি(া প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে বসে আছেন। বহু টাকা খরচ করে, জমি বন্ধক রেখে, বাড়ির গহনা বিক্রি(করে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রশি(ণপ্রাপ্ত হয়েছেন। পি টি টি আই-এর ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে কখনও বি(োভ, কখনও অবস্থান আর অন্যদিকে প্রতিনিধি দলকে নিয়ে কখনও রাজ্যপাল বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানে রাজ্যের অপদার্থতার কথা তুলে ধরে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। এমনকি রাজ্য - কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বার বার সাংবাদিকদের সামনে পি টি টি আই ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদ(প নেওয়ার কথা বললেও আজও পর্যন্ত এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সমাধানে এগিয়ে আসেনি কেন্দ্র বা রাজ্য।

তৃণমূল কংগ্রেস পি টি টি আই ছাত্রদের দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন জানায় এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে।

রাজ্য সরকারের অপদার্থতার কারণে উদ্ভূত সমস্যা প্রয়োজন হলে 'অধ্যাদেশ' (Ordinance) জারি করে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানায়।

✿ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০ হাজার পার্শ্বশি(করা তাদের বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবি নিয়ে রাজ্যের সিপিএম সরকারের বি(দ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস

ইতিমধ্যেই দলের পতাকার-রঙ বিচার না করেই আন্দোলনকারী পার্শ্বশি(কদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পার্শ্বশি(কদের মূল দাবি বেতন বৈষম্য ও স্থায়ী শি(ক পদে তাদের স্থায়ীকরণ।

এ ছাড়াও সর্বশি(া মিশনের অন্তর্গত শি(া প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্শ্বশি(ককে যে বেতন অন্য রাজ্যে দেওয়া হয় তা থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ। ফলে পার্শ্বশি(কদের মধ্যে অন্য রাজ্যের সঙ্গে চরম বেতন বৈষম্য থেকে গেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস অবিলম্বে পার্শ্বশি(কদের স্থায়ীকরণ ও বেতন বৈষম্য দূর করে প্রাথমিক শি(ার শি(কদের আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করার দাবি জানায়।

চুক্তি(র ভিত্তিতে নিয়োগ বাতিল করতে হবে। সরকারি (ত্রে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা দিতে হবে।

পঞ্চায়েত

'প্রতি নাগরিকের মাথার ওপর ছাদ'—এই মূল নীতির ভিত্তিতে জাতীয় গৃহ নীতি ও 'প্রতি গৃহে বিদ্যুৎ'-এর ভিত্তিতে জাতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, 'প্রতি গৃহে পরিস্রুত পানীয় জল'-এর ভিত্তিতে জাতীয় পানীয় জল সরবরাহ পরিকাঠামো এবং ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করার ল(্যে বিস্তৃত সার্বজনীন নীতিযুক্ত(গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

১০০ দিনের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু হওয়ার আগে চালু ছিল সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা। এটি সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। মজুরদের চেয়ে লাভ বেশি হচ্ছিল ঠিকাদারদের এবং এতে মজুরির মাধ্যমে গ্রামীণ গরিবের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যটাই হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাজের (ত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্র(টিও থেকে গেছে উপে(িত। সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট অনুসারে ৭০২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গায়েব হয়েছে এই প্রকল্পের ২৫ কেটি ৮৩ ল(টাকা। ৩৩টি পঞ্চায়েত সমিতিতে একইভাবে লোপাট হয়েছে ১০ কোটি ৬৩ ল(টাকা। উৎকোচপ্রিয় সরকারি আধিকারিকদের সহায়তায় পার্টি-আশ্রিত ঠিকাদাররা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নির্মাণকাণ্ডে লুট করেছে ১১ কোটি ৮৮ ল(টাকা। প্রশাসনিক আযোগতার কারণে হারিয়ে গিয়েছে কোটি কোটি টাকা। প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় সরকারে কাছ থেকে আসে গ্রামোন্নয়নে ও জনকল্যাণে কোটি কোটি টাকা। রাজ্যের প্রশাসক ও দলদাসেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সব টাকা লোপাটে তাদের কুকীর্তির অগণিত নমুনা রেখে গেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যাবতীয় নথিপত্রে। বিভিন্ন অডিট রিপোর্টে ধরা পড়েছে এরই বেশ কিছু নমুনা। গ্রামস্বরাজের অভিমুখে যাত্রা শু(হয়েছিল পঞ্চায়েতিরাজের। এই ল(্য পূরণেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন লিপিবদ্ধ হয় ১৯৭৩ সালে। আর কার্যকর হয় ১৯৭৮ সালে। কিন্তু সম্পূর্ণ সিপিআই(এম) করণ করতে গিয়ে ৮৮.৭৫১ বর্গকিলোমিটার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ৫.৭৭ কোটি অধিবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসাবে আজও বিকশিত হতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত। তাই গ্রামসংসদের সভায় সাধারণ গ্রামবাসীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ৩২ বছর ধরেই ব্যর্থ বামফ্রন্ট সরকার।

সে কারণে মানুষ জানতে পারেন না বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, আলোচনার মাধ্যমে তৈরি করতে পারেন না আগামী বছরের পরিকল্পনা, দিতে পারেন না বিভিন্ন

অনুদান কারা পাবেন তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রাপক তালিকা। এর ফলে স্বচ্ছতা ও গণ-অংশগ্রহণের মূল অস্ত্রটিকেই গণতন্ত্র থেকে তুলে নিয়ে সিপিআই(এম) চালু রেখেছে একটি অগণতান্ত্রিক পার্টিতন্ত্রের ত্রীড়নক মলাটসর্বস্ব পঞ্চায়েতিরাজ। ৭০ শতাংশ মানুষের জন্য পরিকল্পনা কমিশন নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় অনুদানের টাকা অসাধু মতলববাজ কমরেডরা পঞ্চায়েতের নামে ৩২ বছর সমান্তরাল পরিকাঠামো বানিয়ে দলদাস ও অনুগতদের নিয়ে লুটেপুটে খেয়েছে। এ কারণেই বছরে ১০০ দিনের নিশ্চিত কাজের বদলে গ্রামীণ গরিবের জোটে বছরে ১৪/১৫ দিনের কাজ। ছাদহীন মানুষ আস্তানা না পেলেও খরচ হয় না ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা, কালোবাজারে চলে যায় বিপিএল, অন্ত্যোদয়, অন্নপূর্ণা যোজনার চাল-গম। ২০০৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই অনাচার ও দুর্বৃত্ত-লুণ্ঠনের বি(দ্ধে দলদাস রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সবরকম অসহযোগিতা সত্ত্বেও গ্রামীণ বাঙালি গণরায় দিয়ে সিপিআই(এম)-কে উচিত শি(া দিয়েছেন।

তৃণমূল স্তর থেকে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা তৈরির জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে এবং এতে পরিকল্পনা কমিশনকে সামিত করতে হবে। পঞ্চায়েতী রাজ ও পৌর স্বায়ত্তশাসনকে আরও (মতাশীল, সত্রি(য়, গণমুখী, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত(করতে হবে।

সরকারি কর্মচারী

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য (ে ত্রগুলোর মতোই শোচনীয়। ফিফথ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওটা শেষ করে সিক্সথ পে-কমিশনকেও আপ-টু-ডেট করতে হবে। এ(ে ত্রে জানুয়ারি ২০০৬-এর থেকে মার্চ ২০০৮ এই ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনওভাবেই দিতে রাজি নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে।

এছাড়া সরকারি (ে ত্রে সাড়ে তিন ল(শূন্য পদ আছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক নিয়োগ হলে সাড়ে তিন ল(বেকার যুবকের চাকরি নিশ্চিত। এর পাশাপাশি ওই সাড়ে তিন ল(শূন্য পদে লোক নিয়োগ হলে চাকরিরত সরকারি কর্মচারীদেরও প্রমোশন হতে পারে। যা বছরের পর বছর আটকে আছে।

সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শি(া, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বেতন প্রায় অর্ধেক।

সরকার বিরোধী সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির সবাই যাতে দলের উর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে লড়ে তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সচেষ্ট থাকবে।

পুলিশ ও প্রশাসনিক সংস্কার

৩২ বছরের বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে সমাজ বিরোধীদের লীলা(ে ত্র। বেড়েছে উগ্রপন্থী, চরম নৈরাজ্যের শিকার আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি হয়েছে উগ্রপন্থীদের 'গেটওয়ে'। সীমান্ত পেরিয়ে অপরাধীদের নিত্য যাওয়া আসায় চলে অবাধ অপকর্ম। গোয়েন্দা পুলিশের নাকের ডগার ওপর দিয়ে ওই কাজ চলছে অনবরত। অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকার থেকেছে নীরব নিশ্চুপ। আর নিরীহ সাধারণ পুলিশ কর্মীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সিপিএম দল নিজেদের আখের গোছাচ্ছে।

সারা পশ্চিমবঙ্গে থানার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো। তার মধ্যে কলকাতা পুলিশের অধীনে আছে ৪৮টি থানা। কনস্টেবল আছে ২৮,০০০। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে আছে ৭০,০০০ কনস্টেবল। এছাড়া ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর ও সাব ইন্সপেক্টর, এ এস আই বিভিন্ন পদ। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট (মতায় আসার সময় পশ্চিমবঙ্গে আই পি এস পদের সংখ্যা ছিল ১২৬ বর্তমানে ২৫২। সে তুলনায় অধস্তন কর্মচারীদের প্রমোশনের সুযোগ প্রায় স্তিমিত। সমাজের সর্বস্তরের মত প্রশাসনের মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের তাঁবেদার গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ব্যাপকভাবে। নিজেদের অস্তিত্ব র(ার তাগিদে আইনের মূল্য প্রায় নেই বললেই চলে। এই রাজ্যে বামফ্রন্টের (গু(ত্বপূর্ণ ব্যক্তি() চেয়ারম্যান এক বিচারপতিকে যেভাবে চূড়ান্ত হেনস্থা করেছিলেন তা অশি(া ও কু(চিকর নৈরাজ্য তৈরিরই নামান্তর।

পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে যে সমস্ত সৎ লোক রয়েছেন তারা হয়ে গেছেন কোণঠাসা। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য প্রত্যন্ত ও বিশৃঙ্খল অঞ্চলে বদলিকরণ বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর চরম অস্ত্র। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদেরকে অন্যায়ভাবে থানায় নিয়ে গিয়ে নানা কেস দিয়ে অত্যাচার করা সিপিএম-এর নির্দেশে এখন জলভাত। থানা লক-আপে মৃত্যুর মিছিল বাম জামানার অন্যতম কলঙ্ক, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ সিপিএম-এরই অবদান। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার গঠন করলে প্রথমেই তারা প্রশাসনিক স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর জোর দেবে—

- ✿ গণতন্ত্রের স্বার্থে স্বচ্ছ-অবাধ নির্বাচন পরিচালনা এবং ত্রুটিমুক্ত(ভোটার তালিকা প্রণয়নের ল(্যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মীবাহিনী সমেত স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- ✿ তথ্যের অধিকারকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে হবে।
- ✿ পুলিশি ব্যবস্থাকে রাজনীতিমুক্ত(করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা র(া ও অপরাধের তদন্ত সম্পর্কিত পুলিশি কর্তব্যকে দুটি আলাদা বিভাগে পৃথকীকরণ করতে হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এযাবৎ প্রায় বিভিন্ন জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশ ও শীর্ষ আদালতের রায়কে অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে।
- ✿ রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন ও কালো টাকার প্রভাব মুক্ত(করতে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ ও শীঘ্র আদালতের রায়কে বাস্তবায়িত করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।
- ✿ সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে অত্যাচার বন্ধ করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ অধস্তন পুলিশ কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দেওয়া, অন্যান্য রাজ্যের মতো ন্যূনতম চারটে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা।
- ✿ আই পি এস অফিসারদের আদর্শ ও সততার সঙ্গে স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করার জন্য সাহায্য করা।
- ✿ পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে কাজের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া।
- ✿ প্রকৃতভাবে আইনের র(কদের সঠিক ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো এবং থানাগুলিকে রাজনীতিকদের আখড়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত(করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা।

- ✿ পুলিশের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করাকে সম্মান প্রদান ও সঠিক (তিপূরণের ব্যবস্থা করা।
- ✿ দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর সন্তানের শি(ার দায়িত্ব গ্রহণ করা।
- ✿ পরিবারের কর্মসংস্থান করা।
- ✿ সঠিক বেতন পরিকাঠামো রূপায়ণ করা।
- ✿ পুনরায় পুলিশের রেশন ব্যবস্থা চালু করা।
- ✿ পুলিশের পরিবার ও সামাজিক জীবনের মান উন্নত করার জন্য সাহায্য করা।
- ✿ পুলিশকে নিরপে(ভাবে ও আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করার সুস্থ পরিবেশ দেওয়া।
- ✿ কর্মরত অবস্থায় যে কোনও পুলিশ কর্মচারীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর (ে ত্রে পরিবারের স(ম ব্যক্তি(র চাকরি ও সন্তানের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শি(ার পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে সরকারের।
- ✿ সাধারণভাবে পুলিশ কর্মচারীর সন্তানদের মাধ্যমিক পর্যন্ত শি(ার পূর্ণ দায়িত্ব ও উচ্চশি(ার বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা।
- ✿ প্রতি জেলায় পুলিশ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিশেষ ব্যবস্থা, হেলথ্ কার্ড-এর ব্যবস্থা।
- ✿ পুলিশ কর্মচারীর দৈনিক কাজের ঘন্টা সুনির্দিষ্ট ভাবে বেঁধে উপযুক্ত(অবসরের ব্যবস্থা করা। অমানবিকভাবে একটানা ডিউটির বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করা হবে।
- ✿ মন্ত্রী, আমলা, পার্টির নেতা ও উচ্চপদস্থের ব্যক্তি(গত পারিবারিক কাজে অধস্তন পুলিশ কর্মচারীকে লাগানো বন্ধ করা হবে।
- ✿ পুলিশ কর্মচারীর বিভিন্ন কাজের চরিত্র অনুযায়ী বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।
- ✿ পুলিশকে মানবিক সমাজের উন্নততর প্রশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।
- ✿ বেতন কাঠামোয় বেসিক বেতন ও ঘরভাড়া ভাতা খুবই কম। ডিএ-ও আপ-টু-ডেট হয়না। আসলে পুলিশ কর্মচারীদের (ে ত্রে ফিফথ পে-কমিশনের সুপারিশ এখনও কার্যকর হয়নি। ওই রেকমেন্ডেশন ইমপি-মেন্ট করে সিক্সথ পে-কমিশনের অনুসরণে বেতন ও ভাতা দিতে হবে।
- ✿ পুলিশের মধ্যে বেতন বৈষম্যর বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সর্ট আউট করা দরকার।
- ✿ পুলিশকে র(া করার জন্য রিস্ক অ্যালাওয়েন্স-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আইনের শাসন

বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুলিশকে আদেশ দিয়েছিলেন ''দুষ্কৃতী দেখা মাত্রই গুলি চালাও, হিউম্যান রাইট ফাইট পরে দেখা যাবে।'' এই উক্তি(থেকে বোঝাই যায় বামফ্রন্টের অপশাসনে আইন-শৃঙ্খলা ও মানবিক অধিকার র(ার কী পরিস্থিতি হতে পারে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ অবশ্য গুলি চালিয়েছে কিন্তু তা দুষ্কৃতীদের ওপর নয়। বরং দুষ্কৃতীদের রাজত্ব রমরমিয়ে বেড়েছে এক শ্রেণির পুলিশ ও পার্টির নেতাদের মদতে। দুলাল, বুল্টা, হুব্বা শ্যামল, পলাশ, হাতকাটা

দিলীপ, সুবল, সমী(দ্দিন, তপন, সুকুর, তারকে(ের—এমন সব নাম সারা রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, লাঠি চালাচ্ছে আন্দোলনরত শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারীদের ওপর। এমনকি যাদবপুর বি(েবিদ্যালয়ের অনশনরত ছাত্ররাও রেহাই পায়নি—গভীর রাতে বি(েবিদ্যালয়ে ঢুকে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়েছে ওদের ওপরে। মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলন আলিয়া মাদ্রাসা বি(েবিদ্যালয় সহ বিভিন্ন দাবি আন্দোলনকে পুলিশি তাণ্ডবে স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছে।

বামফ্রন্টের শাসনকালে পুলিশের গুলিতে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের তথ্যসূত্রে জানা গেছে জেলখানায় বন্দী মৃত্যুর সংখ্যার বিচারে বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। মানবাধিকার কমিশনের আদেশও বহু(ে ত্রেই মানা হয়নি এ রাজ্যে। জেলা ও মহকুমার জেল হাজতগুলির অবর্ণনীয় দশা—গ(-ছাগলের মতো চেপেচুপে বিচারাধীন বন্দিদের হাজত ঘরে ঢোকানো হয় বহুগুণ বেশি সংখ্যায়। এতে চাপাচাপি ও দমবন্ধ হয়ে এইসব হাজতে মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে এই রাজ্যে।

গণহত্যা, লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ আর ধর্ষণের ঘটনা আকছার ঘটে। বিশেষত যারাই সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করেছে তারাই এর শিকার হয়েছে। এই দীর্ঘ তালিকা শু(হয়েছিল ১৯৮০ দশকে বর্ধমানের করঙ্গী গ্রাম থেকে। বর্তমানে যোগ হয়েছে অসংখ্য ঘটনা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বীরভূম জেলার নানুর, মেদিনীপুর জেলার ছোট আঙারিয়া। যখনই এইসব ঘটনা মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বামফ্রন্ট সরকার লোক দেখানো 'তদন্ত কমিশন' গড়ে তাকে চাপা দিয়েছে, যার কোনও রিপোর্ট আর কোনওকালেই প্রকাশ হয়নি।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে র(া করা নয়, বামফ্রন্ট সরকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়ে সব অধিকারকেই খর্ব করতে সচেষ্ট। কখনও কামতাপুরী, কখনও কে এল ও, গ্রেটার কোচবিহার, অথবা মাওবাদী বা জনযুদ্ধের নাম দিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে এই সরকার বিনা বিচারে আটক করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের একইভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও মানবিক অধিকারের পরিস্থিতির উন্নতি সাধনকে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ অগ্রাধিকার দেবে। আইন-শৃঙ্খলা ও মানবিক অধিকার র(ার ল(্যে নিম্নলিখিত দিকগুলি গু(ত্ব দেওয়া হবে —

- ✿ ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক-সামাজিক ও লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণের আইনগুলিকে আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক হিংসা, ধর্ম ও জাতিভিত্তিক দাঙ্গা ঘটিত অপরাধ দমন ও বিচারের সা(্য প্রয়োগে বিশেষ পুলিশ বাহিনী গড়তে হবে।
- ✿ মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, তপশিলী জাতি তপশিলী জনজাতি কমিশন প্রভৃতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আরও (মতাশালী ও সত্রি(য় করতে হবে এবং এদের সুপারিশগুলিকে আইনি বৈধতা দিতে হবে। সিবিআই-কে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত(একটি প্রকৃত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।
- ✿ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অ(ুন্ন রেখে, সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পান সেই উদ্দেশ্যে বিচার প্রণালী ও আইনকে দীর্ঘসূত্রতামুক্ত(, সহজ ও সরল করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যাতে সামর্থের অভাবে

আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন , সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে।

- রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন ও কালো টাকার প্রভাব মুক্ত(করতে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ ও শীর্ষ আদালতের রায়কে বাস্তবায়িত করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।
- জেলায় জেলায় সাব জজদের গাড়ি ও আর্দালি-সহ বিশেষ ভাতা দিতে হবে।
- গণআন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌছনো।
- গণআন্দোলন ও বি(োভে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত সকলকেই রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে গণ্য করা।
- যাবতীয় ফৌজদারি মামলার আশু নিষ্পত্তি ও বিনা কারণে আটক বন্দীদের মুক্তি(।
- পুলিশ প্রশাসনকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত(করা।
- অভিযোগ দায়ের করা ও স্থানীয় থানার সাহায্যলাভকে আরও সুবিধাজনক করে মানুষের কাছে পৌছনো।

রাজ্যের বেহাল অর্থনীতি

রাজ্যের সরকারি হিসাবর(ার পদ্ধতিগত মানোন্নয়ন দরকার। সরকারি সমস্ত প্রকল্পের (ে(ত্রে একটি সর্বজনস্বীকৃত হিসাবর(ার নিয়ম প্রযোজ্য করা আবশ্যিক হিসাব চিহ্নি(ত হওয়া দরকার। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা আর্থিক নিয়ম বর্হিভূত। এ(ে(ত্রে রাজ্য যদি সে কাজ করে তবে ভবিষ্যৎ প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের আগে রাজ্যের কাছে কৈফিয়ৎ অবশ্যই জ(রি।

বাংলা ও পাঞ্জাবের খন্ডকরণ মেনে নিয়ে ১৯৭৪ সালে ভারত স্বাধীন হল। নিজস্ব সংবিধান এল ১৯৫০ সালে। সেই সময় মাথাপিছু আয় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারত শীর্ষে, পাঞ্জাবের থেকে ১৬.৬ শতাংশ, মহারাষ্ট্রের থেকে ২৬.৩ শতাংশ ও ভারতের জাতীয় গড়ের থেকে ৫৮ শতাংশ এগিয়ে। ডাঃ বিধান রায় তার ১৪ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বে ১৩ বছরই পশ্চিমবঙ্গের এই গৌরবজনক অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্ত(ফ্রন্ট সরকার (মতায় আসার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ চলে গেল মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবের পিছনে। আর ১৯৭৭-র ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার (মতাসীন হওয়ার ৫ বছরের মধ্যেই ১৯৮১-৮২ থেকে মাথাপিছু আয়ে ভারতের জাতীয় গড় থেকে পশ্চিমবঙ্গের সেই যে পিছোনো শু(হল, তা আজও চলছে।

বামফ্রন্টের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের মধ্যে সর্বাধিক ঋণগ্রস্ত রাজ্য। আর কোনও রাজ্য এত অধিক পরিমাণে ঋণ নেয়নি। রাজ্যের মোট রাজস্বের ৪৮ শতাংশই চলে ঋণ আর সুদ মেটাতেই। বামফ্রন্ট (মতায় আসার সময় ১৯৭৭ সালে রাজ্যের ঋণ ছিল ১২০০ কোটি টাকা। আজ তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ২ ল(কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে। চলতি খাতে রাজ্যের মোট আবশ্যিক খরচ, অর্থাৎ সুদ, ঋণ শোধ, মাইনে আর পেনশন, সব মিলে চলতি আয়কে ছাপিয়ে গেছে। রাজ্যকে এই বামফ্রন্ট সরকার এক ঋণের ফাঁদে নিয়ে ফেলেছে —পুরনো ধার শোধ, সুদ মেটানো আর আবশ্যিক খরচ মেটাতেই আবার নতুন ধার নিতে হচ্ছে।

শুধু ঋণের ফাঁদ নয়। এই বামফ্রন্ট সরকার অর্থনৈতিক দুষ্ট ফাঁদেও ফেলেছে রাজ্যকে।

রাজ্য সরকারের রাজস্বের সিংহ ভাগ আসে রাজ্যে উৎপাদিত বস্তু ও তার কেনাবেচার ওপর চাপানো অপ্রত্য(কর থেকে। কিন্তু এই খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ ত্র(মশ সংকুচিত হয়ে এসেছে, রাজস্ব-বৃদ্ধির হার কমে গেছে। কারণ, রাজ্যে কৃষি ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, যেখানে অধিক পরিমাণে মূল্য-সংযুক্তি(ঘটে, তা অব(দ্ধ হয়েছে বামফ্রন্টের অপশাসনে। সাধারণ পণ্য সামগ্রীও আজ চালান আসে অন্য রাজ্য থেকে। এদিকে রাজ্য সরকার সমস্ত রকম উন্নয়ন খাতে মূলধনী ব্যয় কমিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি১০০ শতাংশ অনুদানের না হলে রাজ্য সরকার তা নিতেই পারছে না। যৌথ প্রকল্প, যেখানে রাজ্য সরকারের ১০ বা ২০ শতাংশ মূলধনী ব্যয় করার কথা, সেগুলিও রাজ্য যথাযথভাবে রূপায়িত করছে না। রাজ্য সরকারেরই মানবোন্নয়ন রিপোর্টে (২০০৪, পৃঃ ৭) স্বীকার করা হয়েছে রাজ্য সরকারের মূলধনী ব্যয় কমে আসা ও তার ফলে সৃষ্ট পরিকাঠামো ও সরকারি পরিষেবার সমস্যার কথা। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পণ্য উৎপাদনে মূল্য-সংযুক্তি(বাড়ছে না। ফলে বাড়ছে না রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ। এই পরিস্থিতিতে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হবে মূল্যযুক্ত(বিত্র(য় কর (VAT)ব্যবস্থায়, ত্র(মশ ধ্বংস হবে কয়েক লাখ (ুদ্র, মাঝারি ও অসংগঠিত ব্যবসায়ী। সর্ব(ে(ত্রে বামফ্রন্টের ব্যর্থতা আর অপশাসনের ফলে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের অভ্যন্তরে সৃষ্ট আয়ের অধিকাংশই আজ চলে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে — সাধারণ স্বাস্থ্য ও শি(া পরিষেবার অভাবেই প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা চলে যায় অন্য রাজ্যে।

এমন অবস্থায় আমরা উপনীত হলাম কেন? বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ল(কোটি টাকার ঋণ গেল কোথায়, কোন কাজে? বর্তমানে শিল্প, কৃষি ও সংগঠিত (ে(ত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ বিশেষ নেই। এই সমস্যার উৎস কোথায়? একটু গভীরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় বামফ্রন্টের শাসনে চূড়ান্ত আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি থেকেই আজকের এই অবস্থার সৃষ্টি।

বামফ্রন্ট সরকার সবরকম আর্থিক নীতিকে অগ্রাহ্য করে বছরের পর বছর জনগণের অর্থের অপচয় করেছে । সিএজি অডিটের প্যারাগুলির সদুত্তর দেওয়া ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্বন্ধেও এরা চূড়ান্ত অনীহা দেখিয়েছে। বর্তমানে ১১৯৯ টি অডিট প্যারা আজও ঝুলে আছে যাতে হাজার হাজার কোটি টাকা জড়িত। এই কি কোনও দায়িত্বশীল সরকারের দায়বদ্ধতা আর স্বচ্ছতার পরিচয়? আর্থিক বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি হাজার হাজার কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে নানান কেলেঙ্কারিতে। বাম শাসনে আর্থিক কেলেঙ্কারির দীর্ঘ তালিকায় আছে ট্রাম কোম্পানি ও বেঙ্গল ল্যাম্প থেকে শু(করে ওয়াকফ প্রপার্টি, আলিপুর নাজির কেলেঙ্কারি, তারপর পি এল অ্যাকাউন্ট, মিড-ডে মিল, ভুয়ো রেশন কার্ড, ট্রাক পারমিট ফি, আকরিক লোহা রপ্তানি এমন ঘটনা। বহু সময়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অনুদানের প্রথম কিস্তির অনুদানের পর আর আসে না, ফেরৎ চলে যায়।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তি(শালী করে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর ল(্যে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে কর্মসূচি ঘোষণা ও গ্রহণ করেছেন।

জওহর রোজগার যোজনা (জে আর ওয়াই) এমপ্-য়মেন্ট অ্যাসিওরেন্স স্কীম (এম এ এস) ইন্দিরা আবাস যোজনা (আই এ ওয়াই), মিলিয়ন ওয়েল স্কীম (এম ডব্লু এস), আই আর ডিপি, ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীম, ন্যাশনাল মেটারনিটি বেনিফিট স্কীম, নিবিড় আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প, খরাপ্রবণ এলাকার কর্মসূচি প্রভৃতি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যেমন সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কাজ হয়েছে, ঠিক একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে

ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ হওয়া উচিত। বর্তমানে পুরনো কর্মসূচিগুলির নামকরণ বদলে শুধুমাত্র নতুন নামকরণ হয়েছে। এইগুলি হল -সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (এস জি আর ওয়াই) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামস্বরোজগার যোজনা (এস জে জি এস আর ওয়াই) প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পি এম জি এস ওয়াই), ইন্দিরা আবাস যোজনা (আই এ ওয়াই) ইন্দিরা গান্ধী ন্যশনাল ওল্ডেজ পেনশন স্কীম প্রভৃতি। পঞ্চায়েতের অধিকাংশ কর্মসূচিগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থের কোথাও ৭৫ শতাংশ, কোথাও ৮০ শতাংশ, কোথাও ৯০ শতাংশ আবার কোথাও পুরো টাকাটাই দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত ৩০ বছরের বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের অংশের দেয় টাকা অধিকাংশ আর্থিক বছরেই দেননি ফলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি পুরোপুরি রূপায়িত হয়নি।

এই রাজ্যে প্রশাসনে দূষণ লেগেছে (Administrative polution) পঞ্চায়েতের আয়ব্যয়ের হিসেবের নিয়মিত অডিটের তোয়াক্কা না করে সিপিএম নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলো দরিদ্র মানুষ যারা (ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে (Battle with Hunger) বেঁচে আছে তাদের অভাব, অনটনকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্রকে কিনে নেবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালু আছে, আর তার বিনিময়ে যে জনতা এদের মানসিক ভাবে প্রত্যখ্যান করেছে, তারাই বারবার (মতায় ফিরে আসছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে নানধরনের কৌশলের সঙ্গে এই পদ(পের মাধ্যমেই বারবার (মতায় ফিরে এসেছে।

৩২ বৎসরের বাম জমানায় গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হতে বসেছে।

১) প্রকল্প	**কেন্দ্রীয়**	**বামফ্রন্ট সরকারের আমলে খরচ হয়েছে**
এন আর ই জি এ	১২৮৪ কোটি	৯১৪ কোটি
১২ল(৬৫ হাজার টাকা	৪৭ ল(৭৬ হাজার টাকা	
(২০০৭ -২০০৮)		

ন্যাশনাল (রাল এমপ-য়েন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট

খরচ করতে পারেনি ৩৪৩ কোটি ৩৫ ল(১১ হাজার টাকা

২) **ইন্দিরা আবাস যোজনা (আই.এ.ওয়াই)**	**২৯৩ কোটি ৯১ ল(৭ হাজার টাকা**	**২২৪ কোটি ৯১ ল(৩ হাজার টাকা**
	(২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত)	
	৩৮২ কোটি টাকা	২২৪ কোটি টাকা
	(২০০৭-২০০৮)	

খরচ করতে পারেনি

২০০৬-২০০৭ ৬৯ কোটি ৪ হাজার টাকা

২০০৭ - ২০০৮ ১৫৮ কোটি টাকা

সর্বশি(া অভিযান	২০০৬ - ২০০৭	৯১৯ কোটি টাকা
	১,৪৪০ কোটি	
	২০০৭ - ২০০৮	১০০১ কোটি টাকা
	১৪১২ কোটি	
	খরচ করতে পারেনি	
২০০৬-২০০৭	৫২১ কোটি	
২০০৭-২০০৮	৪১১ কোটি	

শি(াকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে মিড-ডে মিল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প চালু হয়েছে। এতে রাজ্য সরকারের কোনও কৃতিত্বই নেই।

প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা	২০০৬ পর্যন্ত	১ হাজার ৩৩০ কোটি
(পি এম জি এস ওয়াই)	২ হাজার	৬৯ ল(
	৩২০ কোটি ৭ ল(	

খরচ করতে পারেনি

৯৮৯ কোটি ৩৮ ল(টাকা	৩০০৮
ব্যাকোয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড	২০০৭-২০০৮
(বি আর জি এফ)	২৪৪ কোটি

পশ্চিমবঙ্গের ১১ টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া বলে বামফ্রন্ট সরকার নিজেরাই চিহি(ত করেছে। ৩২ বছর রাজত্বের পর এই চেহারা!

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা (আই জি এন ও পি এস) , সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস) সবই কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় চলছে।

গত দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের ৩,৩৫৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২১ টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৭ টি জেলা পরিষদ ও একটি মহকুমা পরিষদের মধ্যে অধিকাংশই সঠিক ভাবে আর্থিক যাচাইয়ের জন্য অডিট করায়নি। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার ঘৃণ্য আত্র(মণাত্মক, ব্যভিচারী, স্বৈরতান্ত্রিক চত্র(ান্তের শিকার হচ্ছে গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষ। লুঠ হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের হাজার হাজার কোটি টাকা।

এসব ব্যতীত সাচার কমিশনের রিপোর্ট সংখ্যালঘু মুসলমান ভাই বোনেদের ওপর অকথ্য অবিচার, আদিবাসী, তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য জনজাতিদেরও অবস্থা এক অবর্ণনীয় দুর্দশায় পরিণত।

তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন)-কে তোয়াক্কা করে না এই স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্য সরকার।

কেরালার দৈনিক মজুরি যেখানে ১২৫ টাকা পশ্চিমবঙ্গে সেখানে তা করা হবে না কেন? এখানে সম্প্রতি করা হয়েছে ৭৫ টাকা।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কালোবাজারি মুনাফাখোরদের বি(দ্ধে ব্যবস্থা নিতে ও মজুতদারি (খতে রাজ্য সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। আর সমাজের এই শ্রেণীর মানুষেরাই আজ সি পি এম- এর প্রধান স্তম্ভ।

আর্থিক বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতির পাশাপাশি আছে বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার উচ্চ পদে পার্টি মনোনীত ব্যক্তি(দের যথেচ্ছাচার। বামফ্রন্ট মন্ত্রীরাও জনগণের টাকা খরচের ব্যাপারে অতি আগ্রহী। সরকার বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের হিসাবে ২০০৩ -০৪ সালে দেখা যায় —বিধানসভার খরচ ২০ কোটি ৯১ ল(টাকা, মন্ত্রীদের জন্য ৪ কোটি ২১ ল(টাকা, মন্ত্রীদের আপ্যায়নের খরচ ১ কোটি ৪৬ ল(টাকা, মন্ত্রীদের যাতায়াতের জন্য খরচ ১ কোটি ১৬ ল(টাকা। এছাড়াও আছে নানবিধ খরচ। মন্ত্রী ও পার্টির নেতাদের পিছনে সরকারি দপ্তরগুলি নানাভাবে খরচ করে যা হিসেবে আসে না। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মালদহ টুরিস্ট লজে তার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে ব্যয় হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা একদিনে। এই খরচ বহন করবে হয় স্বাস্থ্য দপ্তর, নয় পর্যটন দপ্তর। এই সব খরচের ওপরে আছে পার্টির

নেতাদের পুলিশি সুর(ার খরচ। ছোট বড় মাঝারি কোনও নেতাই আজ আর পুলিশের দেওয়া দেহর(ী ছাড়া চলেন না। জনগণের টাকায় এদের সুর(িত রাখার ব্যবস্থা হয়। সরকারি গাড়ির অপব্যবহারের তালিকাও দীর্ঘ । কেষ্ট বিষ্টু সকলেই আজকাল লালবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দায়িত্বভার গ্রহণ করেই আর্থিক কৃচ্ছসাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন —এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানে ফুলের মালাও বর্জন করবেন বলেছিলেন। আজ রাজ্যবাসী মানুষ জানতে চায় সে সবই কি শুধুই প্রচারের আলো মাত্র, কী হলো সেই সব প্রতিশ্রুতির ?

চূড়ান্ত আর্থিক বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতির ভারে বিপর্যস্ত রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থাকে মুক্ত(করা ও পুনর্গঠন করা অতি দুরূহ কাজ। বিশেষত যে পরিমাণ ঋণ রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার , তাতে আর্থিক সংকটের আশু সমাধান পাওয়া কঠিন। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষভাবে গু(ত্ব দিয়ে আর্থিক পুনর্গঠনের ল(্যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করবে যার বিভিন্ন দিক হিসেবে থাকবে—

- কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতিকে অবিলম্বে পর্যুদস্ত করতে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ চাই এবং সাধারণ মানুষের ওপর থেকে পরো(করের পাহাড় প্রমাণ বোঝা কমিয়ে সমাজের স্বচ্ছ অংশ ও কর্পোরেট সেক্টরের ওপর প্রত্য(করের (ে ত্রে ধনাত্মক বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করে রাজস্ব বৃদ্ধির (ে ত্রে সরকারের সদর্থক পদ(েপ নিতে হবে। কালো টাকা উদ্ধারের ও রাজস্ব ফাঁকি দমনে সরকারকে কঠোর হতে হবে।
- সমস্ত রকম অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দন্ডবিধিকে আরও কঠোর ও কার্যকর করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত-সহ এ রাজ্যে এ ধরনের চুক্তি(র মূল্যায়ন করে দোষীদের তদন্ত সাপে(ে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এই রাজ্যে আয়-ব্যয় এর তদন্ত চাই।
- পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা
- কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য ঋণের (ে ত্রে সাময়িক অব্যাহতির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।
- যাবতীয় অনুৎপাদনশীল খরচ কমিয়ে উন্নয়ন খাতে মূলধনী ব্যয় বরাদ্দের বৃদ্ধি করা ।
- বিভিন্ন কর ও শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে কার্যকরী করা ও অনাদায়ী কর ও শুল্ক আদায়ে বিশেষ পদ(েপ নেওয়া।
- কর ও শুল্ক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে রাজস্ব বৃদ্ধি করা। কিন্তু কোনওভাবেই জনগণের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানো নয়।
- কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রকল্পের পূর্ণ রূপায়ণে রাজ্যে অর্থের আগমন বৃদ্ধি করা।
- সরকারি দপ্তরগুলির খরচ কমানো। বিলাসিতা নয়, জনস্বার্থেই জনগণের অর্থ বাঁচানো সরকারের দায়িত্ব।
- দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় শিল্প, বাণিজ্য, ও সামাজিক (ে ত্রের পুন(জ্জীবন ও রাজ্য থেকে অর্থের অর্থের বর্হিগমন রোধ করা।
- মূল্য-যুক্ত(কর বা VAT ব্যবস্থার প্রয়োগকে রাজ্যের স্বার্থে বন্ধ করা।

- রাজ্যে VAT সহ সমস্ত রকম কর বিন্যাস করে uniform Tax চালু করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় প্রকল্পের এক প্রকল্পের দেয় অর্থ অন্য প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া চলবে না এবিষয়ে আর্থিক নীতি ভঙ্গে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রত্যেকটি আর্থিক কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও যাবতীয় জমি বন্টনের তথ্য খতিয়ে দেখে উপযুক্ত(ব্যবস্থা নেওয়া।
- রাজ্যের আর্থিক বেনিয়ম ও রোধে প্রয়োজনীয় পদ(েপ।

অর্থনৈতিক বিকাশের কিছু বিকল্প কর্মসূচি

১) কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প -

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া ও উর্বর জমি কৃষির উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক। এর ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বেশি।

এ রাজ্যে সবথেকে বেশি ধান উৎপাদন হয়।

আলু, সবজি ও মাছের উৎপাদনও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট।

পূর্ব-এশিয়ায় কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির সুযোগ আছে। অথচ এ রাজ্যে পচনশীল কৃষিজাত দ্রব্যের গুদাম নেই। কোল্ড চেন-এর অভাব। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। এর জন্য চাই ---

- কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য রাখার পরিকাঠামো।
- Integrated Cold Chain Network.
- রপ্তানির পরিকাঠামো

এছাড়া উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য ও ফসলের ওপর নির্ভর করে নানা ধরনের খাদ্য প্রত্রি(য়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। এর সম্ভাবনা প্রচুর।

২) কৃষিভিত্তিক শিল্প পাট, চা সহ অন্যান্য শিল্পের উন্নতি

পাটশিল্প – পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব। পাটজাত দ্রব্য অন্য রাজ্যে তৈরি হয় না। পাট শিল্পে নতুনভাবে জোয়ার আসতে চলেছে। বর্তমানে পাট দ্রব্য উৎপাদন (মতা ১৮ ল(টন। অথচ উৎপাদন (মতা হওয়া উচিত ১০০ ল(টন। ইতিমধ্যে পাট শিল্পের কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(এবং সরাসরি নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা আড়াই কোটি। উৎপাদন বাড়লে এই শিল্পে আরও ৩ কোটি মানুষের নতুন করে কর্মসংস্থান হবে।

এছাড়া পাট প্রাকৃতিক তন্তু হওয়ায় ইকোফ্রেন্ডলি অর্থাৎ পরিবেশ সহায়ক তাই সারা বি(ে এখন এর বাজার সম্ভাবনাময়।

পাটশিল্প এখন শ্রমমন্ত্রকের অধীন। পাটশিল্পকে শিল্পমন্ত্রকের অধীনে আনা দরকার।

কৃষি ও শিল্প দু(ে ত্রেই অর্থাৎ সামগ্রিক পাটশিল্পের বিকাশ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দরকার।

চা শিল্প -- কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য বজায় রেখে সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার।

রপ্তানির জন্য আধুনিক পরিকাঠামো প্রয়োজন।

৩) স্টিল ও খনিজ পদার্থের শিল্প

ইস্পাত ও লৌহ শিল্পের বিকাশ -- এখনই এই শিল্পের কাঠামো এই রাজ্যে রয়েছে।

ইস্পাত ও লৌহ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভারি শিল্প স্থাপনে সুযোগ -- এই

শিল্পের কাঠামো রাজ্যে রয়েছে।

গ্রানাইট শিল্প স্থাপনের সুযোগ -- পু(লিয়া ও বাঁকুড়ায় সুযোগ রয়েছে।

রসায়ন ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের শিল্প -- এক সময়ে পঃ বঙ্গের স্থান ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। আবার নতুন করে এ শিল্পের শু(করা দরকার।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের শিল্প

এ রাজ্যে চামড়া শিল্প আছে।

চামড়ার পরিকাঠামো ও বিপুল সংখ্যক কর্মী আছে। চাই শিল্পের আধুনিকীকরণ।

পরিবেশ দুষণের কারণে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিলজলা, তপসিয়া, ট্যাংরা অঞ্চলের এই শিল্প বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বানতলায় দূষণের প্রতিরোধক সহ পরিকাঠামো এখনও তৈরি করা হয়নি। আর সাড়ে তিন ল(ে র বেশি শ্রমিককে বানতলাতে এই শিল্পে পুনরায় যুক্ত(করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ছোটো কারবারীরাও ব্যবসা চালু রাখতে পারেন।

৪) বন্দর ও পরিবহন পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা

কলকাতা বন্দর এক সময়ে দেশের প্রধান নৌ-পোত ছিল। নতুন করে বন্দর পরিষেবা গড়া দরকার।

কলকাতা - হলদিয়া বন্দরে লগ্নি দরকার।

দেশের অভ্যন্তরের মধ্যে জলপরিবহন যোগাযোগ দরকার।

পাঞ্জাব থেকে উত্তর প্রদেশ, বিহার, নেপাল ও দ(ি ণ চিনের জন্য কলকাতা-হলদিয়া বন্দরকে গড়ে তোলা দরকার।

দিল্লি-মুম্বাই ফ্রেট করিডরের মতো হাওড়া থেকে অমৃতসর পর্যন্ত ফ্রেট করিডর চাই।

৫) আইটি শিল্প

এ রাজ্যে আইটি শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ আছে। দরকার নতুন করে রাজ্যের সুযোগ সুবিধার দিকটা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরা। বিশেষ ভাবে টেলিকম সফটওয়্যারের (ে ত্রটি উল্লেখযোগ্য।

৬) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্যাস শিল্প

ক্লিন-কোল টেকনোলজির ব্যবহার চালু করা দরকার।

কোল-বেড মিথেন শিল্পকে বাড়ানো দরকার।

৭) পর্যটন শিল্প

পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝে পশ্চিমবঙ্গ। সবরকমের পর্যটনই এখানে সম্ভব। এছাড়াও আছে সাংস্কৃতিক পর্যটন।

৮) সুশাসন

সারা পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার চালু করা দরকার। ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।

সব থেকে বড় কথা, মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে।

শি(া

এডুকেশনাল ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স ২০০৭ -২০০৮ সালে দেশে সব রাজ্য মিলিয়ে পন্ডিচেরি সর্বশীর্ষে ও সর্বনিম্নে ৫ রাজ্য —ঝাড়খন্ড, অসম, অ(ণাচল, পশ্চিমবঙ্গ, ও

বিহার। স্কুল শেষ করে উচ্চশি(ার অঙ্গনে প্রবেশ করেন ভারতে প্রতি ১ ল(নাগরিককের মধ্যে ৯১৬ জন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৮৩০। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৪ সালে ভারতে এই স্তরে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ১৯.১২ শতাংশ,সেখানে পশ্চিমবঙ্গে হ্রাস পেয়েছে ৯.৩৯ শতাংশ। বঙ্গবাসীরা ভারতীয়ের প্রায় ৮ শতাংশ, কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের সর্বভারতীয় অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ৬.২৭ শতাংশ ও মাধ্যমিকে ৬.৪৪ শতাংশ, ডাক্ত(ারিশাস্ত্রে ১.৭৭ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫.৬৩ শতাংশ, এম এস সি -কে ৫.৮৯ শতাংশ, পি এইচ ডি প্রভৃতি গবেষণায় ০.৯৩ শতাংশ , অন্যান্য পেশা যথা আইন প্রভৃতিতে ০.৬৬ শতাংশ।

শি(া প্রসারের কথা বামফ্রন্ট বললেও জনসংখ্যার অনুপাতে শি(া প্রতিষ্ঠানের গড় ত্র(মশই কমে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে প্রতি ১ ল(অধিবাসী বিছু প্রাথমিক স্কুল ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৬০ টি, সেটি ২০০৩-০৪ সালে নেমেছে গড়ে ৫৯ টিতে! ১৯৬০-৬১ সালে প্রাথমিক শি(ক প্রতি ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯.৩, ২০০৩-০৪ সালে সেটি ৫৪। প্রাথমিকস্তরোত্তর বিদ্যালয় সংখ্যা ১ ল(অধিবাসী পিছু ১০৬০-৬১ সালে ছিল পশ্চিমবঙ্গে ১২ টি, সেই গড় ২০০৩-০৪ সালেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এক ফোঁটাও এগোয়নি।

হয়তো এর ফলেই শেষ আদমসুমারি অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে অন্তত মাধ্যমিক পাশ করেছেন এমন পু(ষ ও নারীর জাতীয় গড় ১৯.১৪ শতাংশ ও ১০.৮০ শতাংশ হলেও রবীন্দ্রনাথের বাংলায় ওই হার যথাত্র(মে ১৬.৫৯ শতাংশ ও ৯.১৯ শতাংশ! এর পরেও কি বলার অপে(া রাখে বামশাসনের ৩২ বছরে পশ্চিমবঙ্গের শি(ার হাল কোথায় দাঁড়িয়ে?

শি(া বিশেষ করে প্রাথমিক (ে ত্রে পশ্চিমবঙ্গে বড় বড় রাজ্যগুলির তালিকায় একেবারে নিচের দিকে।

শি(া স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক (ে ত্রের উন্নয়নে রাজ্যের চরম দুর্দশা বামফ্রন্টের অপশাসনের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। জনগণের মাত্র ৬৯.২ শতাংশ স্বা(র নিয়ে স্বা(রতার হারে দেশের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির অন্যতম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ রাজ্য সরকার 'সর্বশি(া অভিযানে'র টাকা ফেরত পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। প্রাথমিক স্তরে ড্রপ-আউট বা স্কুলছুটদের হার এ রাজ্যে অত্যধিক — দেশের সব রাজ্যের মধ্যে ২৯ তম স্থানে পৌঁছে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এ বিষয়েও রাজ্য সরকার কোনও কিছুই করে উঠতে পারেনি। বরং দেখা গেছে যে রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল চালু করতে রাজ্য সরকারের অনীহাই ছিল। অনেক গড়িমসি করে, নেহাতই বাধ্য হয়ে মিড-ডে মিল ব্যবস্থা চালু করেছে বামফ্রন্ট সরকার আংশিকভাবে আপাতত মাত্র হাজার পাঁচেক স্কুলে। আর একেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে মিড-ডে মিলের টাকা নয়ছয় করার সুযোগ। বহু স্কুলে আদৌ খাবার দেওয়াই হয়নি অথচ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এমনই একটি কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৩২ বছরে রাজ্যে স্কুল শি(ার উন্নয়ন ও বিস্তারে আদৌ কিছু করেনি। এরা (মতায় আসার সময় ১৯৭৭ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখা ছিল ৪২ হাজার ৮৮১। গত ৩২ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা আর বিশেষ হয়নি। আদতে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে খাতায় কলমে সরকারি টাকা নয়ছয় করার উদ্দেশ্যে। রাজ্য সরকারের রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে রাজ্যের ১৮ শতাংশ স্কুলের কোনও

ঘরই নেই আরও ১৮ শতাংশের মাত্র একটি করে ঘর আছে। এই হিসাবে বলা যায় ৩৬ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলের বাস্তবে কোনও কার্যকরী অস্তিত্বই নেই। এই তো বামফ্রন্টের অবদান। অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে না আছে পানীয় জল, না আছে শৌচাগারের ব্যবস্থা, শি(কও প্রায় নেই। প্রায় ৫০ শতাংশ স্কুলে আছে বড় জোর দু'জন শি(ক মাত্র। রাজ্যের বহু গ্রামে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্কুলও নেই ফলে স্বভাবতই দেখা যায় যে প্রাথমিক ছাত্র ভর্তির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে এখন দেশের মধ্যে ১৪ তম স্থানে।

উচ্চশি(ার (ত্রেও চিত্রটি তথৈবচ। পশ্চিমবঙ্গ আছে মোটামুটি ৪৫০ টি কলেজ, যেখানে তুলনা করে দেখা যায়, মহারাষ্ট্র আছে ১৬০০, কর্ণাটকে ১২০০, এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশেও আছে ১১০০ টি কলেজ। তার উপর অধিকাংশ কলেজেই বহু শি(ক পদ খালি —না আছে উপযুক্ত(সংখ্যায় শি(ক, না আছে যথেষ্ট সংখ্যায় ছাত্র। সরকারি উন্নয়ন অনুদানের আভাবে কলেজগুলির জরাজীর্ণ দশা। উচ্চশি(ার সুবিধা বিস্তারের হিসাবে কলকাতা বাদে অন্যান্য জেলা চূড়ান্ত অবহেলিত। বেশির ভাগ কলেজই অবস্থিত কলকাতা আর কলকাতার আশেপাশের জেলায়। বিভিন্ন জেলা ও মফস্বল শহরে, বিশেষত উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে, উচ্চশি(ার সুযোগের চূড়ান্ত অভাব। পাশাপাশি যুগোপযোগী বিষয়ের পঠনপাঠনেও রাজ্যের উচ্চশি(ার মান উন্নয়নেও বামফ্রন্ট সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বাস্তবে রাজ্যের শি(ার প্রসার ও মান উন্নয়নের কোনও নীতি বা সাধারণ চিন্তাভাবনাও বামফ্রন্ট সরকার করেনি। দীর্ঘকাল গয়ংগচ্ছভাবে চলার পর হঠাৎই নব্বই দশকের শেষ ভাগ থেকে তারা ঘুম ভেঙে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শি(ার বেসরকারিকরণ, সেলফ ফাইনান্সিং, আরও ঢালাও তথ্য প্রযুক্তি(র বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠায়। অনৈতিকভাবে ফী বৃদ্ধি করেছে সরকার যার কোনও যুক্তি(গ্রাহ্য ভিত্তি নেই। শি(ক নেই, পরিকাঠামো নেই, অথচ কাগজে কলমে নতুন নতুন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব চাপানো হয়েছে বিভিন্ন কলেজে।

শুধু তথ্য প্রযুক্তি(নয়, অন্যান্য যুগোপযোগী বিষয়, যেমন মাইত্রে(াবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স, মেডিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট, মেরিন সাইন্স, ফরেষ্ট সাইন্স, (রাল টেকনোলজি, (রাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নার্সিং, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি নানা বিষয় অন্যান্য রাজ্যে পড়ানো শু(হতে থাকে'৮০-র দশক থেকেই ত্র(মে ত্র(মে। ফলে এইসব বিষয় পড়ানোর যোগ্য শি(কের অভাব অন্যান্য রাজ্যে হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে এইসব বিষয়ের পঠন পাঠনের কথা বলতে শু(করেছে। কিন্তু বহু বিষয় পড়াবার মতো যোগ্য শি(ক মেলা দুষ্কর। বিশেষত জেলা স্তরে বহু সময়ে সাধারণ বিষয়গুলি পড়াবার শি(কই মেলে না। রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় আইন কলেজ, মেডিকাল কেলেজ এমনকি নার্সিং পড়ানোর কলেজও অতি নগণ্য। ফলে উপযুক্ত(শি(ণ প্রাপ্ত নার্স পাওয়ার এ রাজ্যে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার স্বাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন প্রতি পাঁচহাজার ছাত্রের জন্য স্কুলে স্কুলে কমপিউটার শি(ার ব্যবস্থা করবে। এই প্রতিশ্রুতির এক বিন্দুও পালিত হয়নি। প্রচার সর্বস্ব বামফ্রন্ট সরকার কোনও পরিকল্পনার ধার ধারেনি, শি(ক কোথা থেকে আসবেন সে হিসেবটুকুও করেনি।

প্রচার সর্বস্ব খামখেয়ালিপানায় উচ্চশি(া হয়ে গেছে যেমন তেমন গোঁজা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শনমাত্র। অসংখ্য শি(ক পদ শূন্য। স্কুল কলেজ, বি(েবিদ্যালয় মিলে সংখ্যাটি এক লাখের কাছাকাছি। বামফ্রন্ট সরকারে পূর্ণ সময়ের শি(ক নিয়োগ বন্ধ রেখেছে - কাজ চালানো হচ্ছে স্কুল স্তরে এক হাজার টাকা মাস মাইনের পা(েশি(ক বা প্যারাটিচার নিয়োগ করে। হিসেব করে দেখা যায় এই শি(করা ন্যূনতম দৈনিক মজুরি

থেকেও কম মাইনে পাচ্ছেন। কলেজ বি(েবিদ্যালয় স্তরে এই সরকার চালু করেছে ঠিকা-শি(ক বা কনট্রাক্ট প্রথা। মাইনে দুই থেকে বড় জোর (ত্রে বিশেষে চার হাজার টাকা। পা(ে-শি(ক, আংশিক সময়ের শি(ক ও কনট্রাক্ট প্রথা। শি(কদের সংখ্যা মোট পূর্ণ সময়ের শি(কদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। বামফ্রন্টের অপশাসনে শি(া ব্যবস্থাটাই আজ চলেছে কোনও মতে ঠেকা দিয়ে আর শি(কদের কম মাইনে দিয়ে প্রবঞ্চিত করে।

চূড়ান্ত রাজনীতিকরণের ফলে শি(া প্রতিষ্ঠানগুলির মান ত্র(মাগতই নেমেছে গুণগত মানের এই অব(য়ে রাজ্যের শি(া ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে আর এক গভীর সমস্যা। এ কথা সর্বজনবিদিত যে বি(েবিদ্যালয়ের উপাচার্য, শি(ক থেকে শু(করে পিওন বা ঝাড়ুদার পর্যন্ত নিয়োগ হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, পার্টির নিজেদের লোক বেছে। ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংত্র(ান্ত নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয় না বহু (ত্রেই। বাস্তবে শি(া প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বা চাকরিকে বামফ্রন্ট সরকার ব্যবহার করেছে পার্টির সর্ব(ণের কর্মীদের (হোল-টাইমার) পরিবারের ভরণ পোষণের কাজে। এমন কোনও পার্টির গু(ত্বপূর্ণ কর্মী বা নেতা পাওয়া যাবেনা যার পরিবারের কেউ না কেউ শি(া প্রতিষ্ঠানে কোনও না কোনও চাকরি পেয়েছে। এইভাবে ঘুরপথে রাজ্যবাসী মানুষের ঘাড়ে চেপেছে ভরণপোষণের দায়িত্ব যা সহসা দৃষ্টিগোচর হয়না। ভুইফোঁড় শি(ক, শি(াকর্মী, আধিকারিক আর শি(ক নেতাদের দাপাদাপিতে শি(া প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়েছে। স্বজনপোষণ, বেনিয়ম আর এদের হেনস্থার শিকার হয়েছে সাধারণ শি(ক ও শি(াকর্মীরা। রাজনীতির দলে নাম লেখায়নি এই অপরাধে বহু সময়েই সাধারণ শি(ক ও শি(াকর্মীরা বঞ্চিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠান থেকে আইনত প্রাপ্য চাকরির শর্তপূরণেও। স্বভাবতই বাধ্য হয়ে এদের শেষ বিচারের আশায় শরণাপন্ন হতে হয় আইন-আদালতের। স্কুল শি(ামন্ত্রীকে স্বীকার করতে হয়েছে যে শি(া-সংত্র(ান্ত মামলায় সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে। কিন্তু এমনটা কেন সে প্রশ্নের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে নারাজ। এই তথ্য নির্দেশ করে সামগ্রিকভাবে শি(াপ্রতিষ্ঠান গুলির পরিচালনায় বামফ্রন্ট সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ। এদের অপশাসনে রাজ্যের মানুষ আস্থা হারিয়েছে শি(া ব্যবস্থার প্রতি। প্রতিবছরই তাই হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী পাড়ি দিচ্ছে অন্য রাজ্যে উপযুক্ত(শি(ার সন্ধানে।

শি(া প্রসারের নামে বেসরকারি উদ্যোগে পরিকাঠামোহীন গজিয়ে ওঠা শি(া প্রতিষ্ঠান যার বেশির ভাগ বর্তমান শাসককূলের আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই সমস্ত শি(া প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সং(-ষ্ট দপ্তরের / বিভাগের অনুমোদন আছে কিনা তা তদন্ত করার দাবি জানায় তৃণমূল। এই সমস্ত শি(া প্রতিষ্ঠানে আকাশচুম্বি ফি ও আনুষঙ্গিক খরচের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বিধির ব্যবস্থা করতে হবে। অনুমোদনের সময় পরিকাঠামো, শি(ক মন্ডলী ও পড়ুয়াদের বার্ষিক বোঝা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরী(ার প্র(েপত্র হিন্দি ভাষাতেও তৈরি করতে হবে। সকলের জন্য শি(ার দায় নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

বুনিয়াদী শি(াকে (প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর) আবশ্যিক ঘোষণা করে রাষ্ট্রকে এর সর্বজনীন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে ও ভারতকে অচিরে নির(রতার অভিশাপমুক্ত(করতে হবে।

স্বাস্থ্য

১৯৫০ সালের তুলনায় জন্মহার অনেকটা হ্রাস পেলেও কেরল প্রভৃতির থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে। ২০০৬ সালে হাজার পিছু জন্ম হার ছিল কেরলে ১৫ আর পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে ১৮। প্রগতিশীলতার রোলমডেল বলে দাবি করা সিপিআই(এম) শাসনে পশ্চিমবঙ্গ শহরে আর গ্রামের জন্মহারে বিহার, অসমের মতোই ফারাক। ২০০৬ সালে এখানে জন্মহার গ্রামে ২০.৭ ও শহরে ১২.৩। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স্কা নারীদের ৫ জনের ২ জনের দৈহিক ওজন উচ্চতার অনুপাতে কম আজও। রক্তাল্পতা ও দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে আত্র(ান্ত পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশ মহিলা। প্রতি ১ ল(পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে ১৭৫৪ জন প্রতিবন্ধী ও ১৬৯ জন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। আজও পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতিতে জন্মায় মাত্র ৪২ শতাংশ শিশু। ৫৮ শতাংশরই এই সুযোগ জোটে না। প্রসব কালে ডাক্ত(ার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পাওয়া যায় মাত্র ৪৮ শতাংশ (ে ত্রে। যে কোনও এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ভর করে ডাক্ত(ারের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রতি ১৯৫৬ জন বাসিন্দা পিছু আছেন ১ জন রেজিস্টার্ড এলোপ্যাথিক ডাক্ত(ার। যাদের বেশিরভাগটাই শহরকেন্দ্রিক। ২০০৫ সালে ৭৮৩ জন শহরবাসীর পিছু ১ জন ডাক্ত(ার থাকলেও, সাড়ে ৪ হাজার গ্রামীণ বাঙালি পিছু ১ জন ডাক্ত(ার। গ্রামে ৪৬৬৬ জন অধিবাসী পিছু ১ টা হসপিটাল বেড। ২০০৬-০৭ এ পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে আট কোটি বাসিন্দার জন্য বরাদ্দ রাজ্যসরকার নিয়ন্ত্রিত সর্বস্তরের চিকিৎসাকেন্দ্রের মিলিত বেডের সংখ্য হচ্ছে ৫৭,২৪৩ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ৯১,৯৩৪। এর আবার ২৩,৪২৬ টিই কলকাতায়, ৮৬৪৯ বর্ধমানে ও ৭৩৩৬ উত্তর ২৪ পরগণায়। বাদবাকি সব জেলা মিলিয়ে। এর ওপর আছে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করার অত্যধিক খরচ যা জাতীয় গড়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এন এস এস রিপোর্ট ৫০৭ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ার গড় খরচ ২৪৬৪ ও ১০,৩৩৯ ভারতে ৩২৩৮ ও ৭৪০৮ টাকা এবং বাংলায় শহরে ৪৩১২ ও ১৬০২৫, ভারতে ৩৮৭৭ ও ১১,৫৫৩ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হাল এতোটাই খারাপ, যেখানে একই বেডে বা অপ্রতুল বেডের দ(ণ মেঝেতে (গী ও কুকুর শয্যাসঙ্গী ও রোগীর চোখ অক্লেশে খুবলে খায় ইঁদুর, সেখানে মানুষ আকৃষ্ট বেসরকারি ব্যবস্থায়, যার হাঁড়িকাঠে প্রত্যহ বলি হচ্ছে গরিব মানুষের পকেট। তাই ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুতে বাংলায় আবার মানুষ মরছেন কুষ্ঠ রোগাত্র(ান্তের অনুপাত জাতীয় গড় থেকে বেশি। রক্ত(পরী(ার কিটেই (Kit) ভেজাল! রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবারই আশু-চিকিৎসা দরকার আজ।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু এর ফলে রাজ্যের মানুষের দুর্ভোগ আর হয়রানি ঘটেছে অনেক বেশি। বামফ্রন্টের শাসনকালে গত ২৯ বছরে রাজ্যে হাসপাতালের সংখ্যা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা, এমনকি ডাক্ত(ার ও নার্সের সংখ্যার কোনও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে সর্বভারতীয় হারের তুলনায় দেখা যায় রাজ্যে জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা অতি নগণ্য ও হাসপাতালের শয্যাপ্রতি রোগীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত(বেশি। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কী হাল। এখানে পিপড়ে চোখ খুবলে খায় অচৈতন্য রোগিনীর, ঘন্টায় ঘন্টায় শিশুমৃত্যু ঘটে, ইঁদুরে বিড়ালে আঁচড়ে কামড়ে খায় সদ্যোজাত শিশুকে । আর নির্বিকার বামফ্রন্ট সরকার হাসপাতালের ফী বৃদ্ধি করে তিনগুণ।

স্বাস্থ্য পরিষেবার আর একটি গু(ত্ব সমস্যার দিক হল রাজ্য জুড়ে এর বিস্তারের অভাব। বামফ্রন্ট সরকার জেলাস্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার ঘটানোর দিকে কোনওই নজর দেয়নি। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ সরকারি হাসপাতাল ও হাসপাতাল শয্যা এবং উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগ আছে কেবলমাত্র কলকাতায়। তাই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষকে ছুটে আসতে হয় কলকাতায়। জেলা ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অবস্থাও অবর্ণনীয় -- ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে, ডাক্ত(ার নেই, ওষুধ মেলে না বিশেষ কিছু। সরকারি রিপোর্টই (মানবোন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪, পৃঃ ১৩৬) স্বীকার করেছে ''স্বাস্থ্য পরিষেবার মোট পরিকাঠামো রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় আজও অল্প এবং যা আছে তারও গুণগত মানের সমস্যা আছে।'' স্বভাবতই প্র(জাগে তাহলে ৩২ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার করলটা কী!

রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে হাজারে হাজারে মানুষ শুধুমাত্র বিশেষ চিকিৎসা নয় সাধারণ রোগেও বাধ্য হয়ে ছুটে যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে। এই অবস্থার পরিবর্তনের উপায় কী? প্রচার-সর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বেসরকারিকরণের টোটকা দাওয়াই ছাড়া আর কিছু জানা নেই। তাই বামফ্রন্ট সরকার উদ্যত হয়েছে স্বাস্থ্যকে ব্যবসায় পরিণত করতে। সরকার জমির দালাল হিসাবে বেসরকারি নার্সিংহোম আর স্বাস্থ্য উপনগরী গড়তে জমি খুঁজে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। জীবনদায়ী ওষুধ অমিল। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এই সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিণত করেছে জীবন্ত মানুষের যমালয়ে।

স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ চলছে সরকারি মদতে । চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যধিক ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে তা ত্র(মশই সাধারণ মানুষের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ভগ্নদশা লজ্জাজনক। স্বাস্থ্য প্রশাসনে চূড়ান্ত অনৈতিক দলীয় নিয়ন্ত্রণ গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকেই পঙ্গু করে দিয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে যাতে একজন নাগরিকও সামর্থের অভাবে বঞ্চিত না হন, সেটিকে সুনিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে। সহজলভ্য ও সার্বজনীন করতে হবে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে।

বিনা ব্যয়ে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের ল(্যে বিনা মূল্যে মেডিকেল কার্ড বিতরণ করতে হবে।

পরিবেশ

বিগত ৩২ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে পরিবেশ সংত্র(ান্ত ও জলাভূমি সংর(ণের বিষয়টি উপে(তই থেকে গেছে। মানুষের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তগুলোই পূরণ করতে পারেনি এই সরকার। পরিবেশ সংর(ণের বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার না নিয়েছে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকল্প না করেছে সঠিক কর্মসূচির প্রণয়ন। উপরন্তু বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক সিপিআইএম আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে বসে নিজেদের স্বার্থ র(ার তাগিদে একর পর এক জলাভূমি ধ্বংস করে করে গেছে ক্যাডার তোষণ। গড়ে তুলেছে প্রোমোটাররাজ। নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে জনসাধারণ। জলস্তর নেমে গেছে অনেক নীচে। নদনদী এবং খালের স্বাভাবিক গতি হয়ে গেছে (-থ এবং আর্সেনিক দূষণে আত্র(ান্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জেলার পর জেলা। কুচত্রী বামফ্রন্টের ভুল স্বার্থসর্বস্ব নীতির শিকারে সোনার বাংলা আজ

মৃতপ্রায়। একের পর এক জলাভূমি বুজিয়ে এই সরকার তৈরি করে চলেছে একের পর এক টাউনশিপ এবং শপিং মল ও ফ্লাইওভার। উৎসাহিত ক্যাডারবাহিনীদের আসাধু প্রোমোটার চত্র(। খুন, জখম, রাহাজানিতে এই চত্র(এখন আর্ন্তজাতিক মাফিয়ায় পরিণত।। ভূমি(য়ে পরিবেশের ভারসাম্য এখন নষ্ট হতে হতে ধ্বংসমুখে পতিত।

এখনও যদি পরিবেশ সংর(ণের বিষয়ে আমরা চোখ বুজে থাকি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যাবে আরও বিপন্ন। এই পরিবেশকে র(া করতে তাই চাই সঠিক ভাবনাচিন্তার এক আধুনিক পরিবেশ সংর(ণ নীতি। তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার পরিবেশকে বাঁচাতে বাংলার মানুষের জন্য যে কার্যকরী ভূমিকা নিতে বদ্ধপরিকর তা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

- অবিলম্বে পরিবেশ কমিশন গঠন করতে হবে ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করতে হবে।
- পরিকল্পনাহীন নগরায়ন ও যত্রতত্র আবাসন কমপে-ক্স তৈরি অবিলম্বে বন্ধ করা।
- প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ এবং বন্যপ্রাণীর সঠিক সংর(ণ ।
- জল সম্পদ সংর(ণ, বৃষ্টির জল সংর(ণ ও ভূমি(য় রোধ করা।
- ভূমি-ব্যবহার নীতি ও জৈব বৈচিত্রের সংর(ণ।
- জলাভূমির নির্দিষ্ট কার্যকরী সংর(ণ নীতি তৈরি করা।
- বিকল্প শক্তি(র উৎস তৈরি ও বৃদ্ধি।
- নদীর প্রকল্পগুলির আধুনিকীকরণ বিশেষত মেদিনীপুর ও সুন্দরবন এলাকায়।
- জি.আই.এস এবং জি.পি.এস টেকনোলজির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিকার করা।
- আর্সেনিক দূষণ আটকাতে সঠিক প্রকল্পের রূপায়ণ।
- শিল্পবর্জ্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক পরিশোধনের বন্দোবস্ত করা।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমানো, জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি।

দ্রব্যমূল্য ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দরবৃদ্ধি

পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও গ্যাসের ঘন ঘন দর বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যতিব্যস্ত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর এই দরবৃদ্ধির ফলে তৈরি হয়েছে বাজারে আগুন। সবচেয়ে বড় কথা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিগত পাঁচ বছরে যে ভাবে পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের দরবৃদ্ধি ও রাজ্য সরকার যেভাবে পেট্রোপণ্যের ওপর ট্যাক্স নিয়ে থাকেন তার ফলে রাজ্যবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস পেট্রোপণ্যের ওপর সরকারি ভরতুকির ব্যবস্থা ও দেশিয় উৎপাদনের ওপর গু(ত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। এছাড়া পেট্রোপণ্যে তহবিলে যে বাজার হাজার কোটি টাকা গচ্ছিত আছে সেই অর্থ যথাযোগ্যভাবে তেল উৎপাদন ও খননকাজ-সহ সামাজিক কাজে ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করবে।

সমবায় ব্যবস্থা সম্প্রসারণে আরও উদ্যোগী হবে তৃণমূল কংগ্রেস

রাজ্যে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় করার ল(্যে উদ্যোগ গ্রহণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে রাজ্যবাসীর যে অংশ গরিব-নিম্ন ও মধ্যবিত্ত তাদের কাছে স্বনির্ভরতা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ল(্যে রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থাকে আরও বেশি গতিশীল, সুসংহত, উন্নত ও কার্যকরী ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা

নেবে তৃণমূল কংগ্রেস। সমবায় ব্যবস্থায় (দ্রশিল্প ও (গ্র শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে পুন(জ্জীবন ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দিকেও বিশেষ গু(ত্ব দেবে দল।

পর্যটন

রাজ্যের পর্যটন শিল্পে দেশি-বিদেশি অতিথিদের আকর্ষণ করার ল(্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নতমানের জনসংযোগ ও আয়ত্তের মধ্যে অতিথিশালার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সহ রাজ্যের যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের পীঠস্থান হয়েছে সেই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করার ল(্যে ও রাজ্যের ঐতিহাসিক এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস। পর্যটন শিল্পে সমবায় ও কর্মসংস্থানের ল(্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

সমাজ ও সংস্কৃতি

বামফ্রন্টের ৩২ বছরের রাজত্বে বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে। খোলা হাওয়ায় শিল্প আজ বামফ্রন্ট তথা সি.পি.এম সরকারের 'সংস্কৃতি নন্দন' এর নজরবন্দী। সরকারি রত্ত(চ(ুর আড়ালে হারিয়ে গেছে বাংলার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নিজস্বতা। সরকারি সুযোগ সুবিধা তথা সি.পি.এম - এর পাইয়ে দেবার রাজনীতির আবর্তে বন্দী হয়ে গেছেন আপামর তথাকথিত শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা। ব্যতিত্র(মীরা হয়ে আছেন কোণঠাসা। সি.পি.এম সরকারই ঠিক করেছেন এই পশ্চিমবঙ্গে কে গায়ক হবেন , কে কবি হবেন বা বামফ্রন্ট সরকারের মিথ্যা প্রশস্তি গেয়ে কে হবেন সরকারের তকমা আঁটা বুদ্ধিজীবী । ইচ্ছে থাক বা না থাক অস্তিত্ব র(ার তাগিদে এই চত্রে(টিকি বেঁধেছেন বেশির ভাগ যোগ্যতাহীন উচ্চাভিলাষী অসৎ মানুষেরা। এই তিরিশ বছরের অপশাসনে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম সরকারি পয়সায় করে গেছেন একের পর এক মোচ্ছব। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা, যথেচ্ছ হোটেলের পয়সা খরচ করা, দেশ বিদেশ থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে এসে বাংলার সাহিত্য -সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর নামে আয়োজন করা হয়েছে গান মেলা, সিনেমা মেলা, কবিতা উৎসব, গল্প পাঠের আসর ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সব উৎসবের স্থান পেয়েছে পার্টির তকমাধারী কিছু গজিয়ে ওঠা সাংস্কৃতিক পু(ষ ও মহিলা। এই তালিকায় যেমন আছে পার্টির কোটায় চাকরি পাওয়া শি(ক, অধ্যাপক, অশি(ক সম্প্রদায় তেমনি ভুঁইফোড় আছে একদা ক্যাডার বাহিনী থেকে আসা বিভিন্ন সরকারি আধাসরকারি কর্মী, অসদুপায়ে মনোরঞ্জনকারী বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তুলে আনা মনোহারিণী চত্র(আছেন নানা সরকারি আমলাও। যাদের উচ্চারণেই কোনও শুদ্ধতা নেই তারা হয়ে গেছেন আবৃত্তি শিল্পী বা নাটক কর্মী, কেউ কেউ বা সুরের অ আ ক খ না জেনেও হয়ে গেছেন সরকারি বদান্যতায় গায়ক বা গায়িকা। এমনকি এক কালের বহু প্রথিতযশা শিল্পীরাও নিজেদের মান বিসর্জন দিয়ে হয়ে গেছেন সিপিএম সরকারের হাতের পুতুল। সিপিএম এদের কাউকে করেছে এম পি, কাউকে শেরিফ, কাউকে দিয়েছে বি(বিদ্যালয়ের নানান কমিশনের সদস্যপদ। দিয়েছে এরকমই আরও বহু রঙ বেরঙের (মতা। যাতে একদা এদের প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে আর কখনও কখনও কোনও বি(দ্ধ কথা উচ্চারিত না হয়। এদের দিয়েই যাতে করানো যায় সি পি এম-এর দুরাচারের বি(দ্ধে করা

নানান ছবির সেন্সর বা লেখার এডিটিং। নিষিদ্ধ করা যায় সিপিএম এর না পসন্দ বই , সিনেমা ইত্যাদি নানা শিল্প। সরকারি প্রে(াগৃহে নিজেদের প্রয়োজনে সিপিএম ব্যবহার করে চলেছে যথেচ্ছভাবে এমনকি 'নন্দন' চত্বরে তৈরি হয়েছে নানা দোকান ঘর যা বিতরণ করা হয়েছে নামে বেনামে বিভিন্ন শিল্পী, আমলাদেরকেও । জনগণের পয়সার এই অপব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করার সময় এসেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় নন্দন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'মহিলা মেলা'ও। যারা 'অপসংস্কৃতি' 'অপসংস্কৃতি' করে চেঁচিয়ে পশ্চিমী কালচারের বি(দ্ধতা করে গলা ফাটিয়ে গেছেন এতকাল, এমনকি মিস ইউনিভার্স বা মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় বঙ্গ ললনাদের যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে গেল গেল রব তুলেছিল যে সিপিএম, তাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারই এই মেলার আয়োজক। মহিলা নাম্নী 'প্রোডাক্ট'দের নিয়ে মেলার আয়োজন সত্যিই অভিনব। এছাড়া বহু সরকারি উৎসবের 'থালিগার্ল'দের দিয়ে শোভা বর্ধন ঘটিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনাতেও হাত পাকিয়েছেন এ রাজ্যের সিপিএম-এর নেতা ও বামফ্রন্টের সাংস্কৃতিক মুখ্যমন্ত্রী। যার আবার নন্দনের নির্দিষ্ট প্রে(াগৃহে প্রত্যহ সান্ধ্যকালীন বিশ্রাম না নিলে সংস্কৃতিতে শান দেওয়া হয় না। 'নন্দন' হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্রামাগার। বাংলার সংস্কৃতিকে বি(োয়নের মিশেলের ছাঁচে ফেলে একে একে নানান অপকর্মের মানচিত্র তৈরি করেছে সিপিএম সরকার। বঞ্চিত করেছে নানান যশস্বী শিল্পী সাহিত্যিকদের যারা কখনও এই তালে তাল মেলান নি। শম্ভু মিত্র বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা কখনওই পান নি তাদের যোগ্য সম্মান এই সরকারের কাছ থেকে। বেআইনি ভাবে সল্টলেকে অসাধু অবাঙালি ও বাঙালিদের হাতে চলে গেছে একরের পর একর জমি। অথচ নাট্যশালা তৈরি করার জন্য শম্ভু মিত্র বছরের পর বছর আবেদন জানিয়েও পাননি এক টুকরো জমি। অবশেষে নিঃশব্দে চলে গেছেন শিল্পী। একইভাবে উদয়শংকরের সংগ্রহশালা স্থাপনেও একটুকরো জমি দেয়নি এই সরকার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ জীবনে না খেতে পেয়ে চলে গেছেন এই সংস্কৃতির পীঠস্থান থেকে। সিপিএম সরকার দেননি তাকে কোনও সরকারি সম্মানও। এই সরকার বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গতিকে ভাইরাস দিয়ে আত্র(মণ করার জন্য তৈরি করেছে 'বাংলা এ্যাকাডেমি'। পার্টি ক্যাডার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে সমস্ত পদ। নিজস্ব ফর্মুলায় তৈরি বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের 'এক্সটেনশন' দিয়ে দিয়ে র(া করছে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে করতে বাঙালি ভুলে যেতে বসেছে তার মাতৃভাষাটাই। মুখ থুবড়ে পড়েছে টালিগঞ্জের সিনেমা শিল্প। উত্তর কলকাতার যাত্রা পাড়া ধুঁকছে ক্যান্সার আত্র(াস্ত রোগীর মতো, নতুন প্রজন্ম জানতেই পারছে না লোকগান, পল্লীগীতি, বাউল গানে সমৃদ্ধ বাংলার সংস্কৃতিকে।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্বতাকে ফিরিয়ে আনতে প্রথম কাজ হওয়া উচিত শিল্প ও সমাজ জীবনকে রাজনীতিকরণের কব্জা থেকে মুক্ত(করা। তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রচেষ্টাকে তরান্বিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে নিম্নলিখিত কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে।

- ✿ সংস্কৃতি জগতের কৃতী ও দুঃস্থ শিল্পীদের অনুদানের ব্যবস্থা করা
- ✿ সংস্কৃতি-শিল্প-সিনেমা ও নাট্যকর্মী, সংগীত ও কলার বিশিষ্ট মনীষীদের যথাযোগ্য সামাজিক সম্মানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত (ে ত্রে সমস্ত মানুষদের মাসিক পেনশন ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
- ✿ শিল্প, সাহিত্য, ত্রী(ড়া ইত্যাদির জগৎকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা
- ✿ সমস্ত ধরনের বাঙালির ঐতিহ্য বহনকারী গ্রামীণ শিল্পকে পুন(দ্ধার করা

- ✿ স্থানীয় প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাদের বিকাশসাধন করা
- ✿ লোক শিল্প এবং আদিবাসী শিল্পকে যথোপযুক্ত(মর্যাদা দেওয়া ও আর্থিক সাহায্য করা।
- ✿ পেশাদারি থিয়েটার ও যাত্রা শিল্পকে আর্থিক অনুদান সহ সমস্ত সাহায্য প্রদান করা।
- ✿ লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশে সাহায্য করা
- ✿ দুর্দশাগ্রস্ত সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(শিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্থিক সহায়তা
- ✿ দুঃস্থ শিল্পী, কলাকুশলীদের মাসিক পেনসনের ব্যবস্থা করা
- ✿ জেলা ও ব্লক ভিত্তিক ত্রী(ড়া ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও মিউজিয়ম তৈরি করা
- ✿ গ্রাম ভিত্তিক 'কম্যুনিটি সেন্টার' তৈরি করা
- ✿ রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির কাণ্ডারীদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে মিউজিয়াম থেকে শু(করে বিভিন্ন গ্যালারি গড়ে তোলা

নারী সমাজ

বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যে নারী নির্যাতনের বহুবিধ কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটছে। নারীর (মতায়ন ও নারীর সমানাধিকারের (ে ত্রে রাজ্যের নারীসমাজ যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছে। শি(ার (ে ত্রে অবনতি ঘটেছে। মানব উন্নয়নের নিরিখেও এরাজ্যে নারী সমাজ পিছিয়ে। বাড়ছে নারীর পণ্যায়ন, পণপ্রথার দাপট, নারী পাচারের মতো ঘটনা।

বামফ্রন্টের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে 'নারী' সমাজের অস্তিত্ব সামগ্রিকভাবে বেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ মহিলারা আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক বেশি ত্রি(য়াশীল। যা অতীত খুঁড়লে আমাদের সামনে আরও বেশি দৃশ্যমান। এমতাবস্থায় 'নারী' দের যথোপযুক্ত(সম্মান দেখানোর বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদিও গত ৩২ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে নারীরা হয়েছেন একের পর এক ধর্ষণের, অবমাননার শিকার। নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে এই সরকার এক শ্রেণির মহিলাদের ব্যবহার করেছে নানাভাবে। বানতলা সহ ঘোকসাডাঙায় নারী ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবিতে যখন বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহিলারা সোচ্চার সেই সময়ই একজন প্রথিতযশা মহিলা সাহিত্যিক এর কণ্ঠে শোনা গেছে 'এবার নয়, পরেরবার এই ঘটনা হলে না হয় দেখব'। আর একজন, দুজন উদারমনা নাটক দলের মহিলা নাট্যকর্মী বলেই ফেলেছিলেন পার্টির মহিলা সমিতির নেত্রী না বললে আমরা কিছু করতে পারব না। ধর্ষণ, অসম্মানে অভ্যস্ত হতে হতে ভীতিতে বা নিজেদের জায়গা হারানোর ভয়ে এরা মা বোনেদের সম্মানকে বলি দিতেও পিছ-পা নন। এই সব বামফ্রন্টের আশ্রয়পুষ্ট তথাকথিত মহিলা সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী বা নাট্যকর্মীরা সমাজের থেকে নিজেদের স্বার্থ চিন্তাতেই যে মশগুল এবং সিপিএম এর রক্ত(চ(ুর ইশারায় চালিকা শক্তি(সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

৩২ বছরের অপশাসনে পরপর বেড়েই গেছে নারীর লাঞ্ছনা। নারী পাচার থেকে শু(করে পতিতা বৃত্তির রমরমা। এমতাবস্থায় হঠাৎ বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কুম্ভীরাশ্রু পতনের শু('যে দারিদ্রের জ্বালায় নারীরা বিপথগামী হচ্ছে'। বাঃ সুন্দর সাংস্কৃতিক উপসংহার বৈকি, অন্তত মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন উন্নয়নের সাইক্লোনেও এখনও

দারিদ্রমোচন সম্ভব হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে নারী পাচারেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম।

পশ্চিমবঙ্গের অরাজকতার আর একটি বিভীষিকার দিক হল নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ত্র(মাগত বেড়েই চলেছে। বহু (ে ত্রেই স্থানীয় পুলিশ থানা এই ঘটনার এফ আই আর গ্রহণ করে না বলে সরকারি তথ্যে প্রকাশ পায় না। রাজ্যের মানুষ কি ভুলতে পারে বানতলা, ধানতলা, ঘোকসাডাঙার গণধর্ষণের ঘটনা? মেয়েদের ওপর যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে পথেঘাটে। এমনকী কলকাতার অভিজাত এলাকা সল্টলেকের পথে ঘাটে হাঁটাও আজ মেয়েদের প(ে বিপজ্জনক। বামফ্রন্ট সরকার নির্বাক দর্শকমাত্র। অথচ মানুষের দাবি নিয়ে যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেছেন, বামফ্রন্ট সরকার তাদের মিথ্যে খুনের মামলা দিয়ে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানবোন্নয়ন রিপোর্টের (২০০৪, পৃঃ ১৬৮) স্বীকার করা হয়েছে যে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ফৌজদারি মামলায় শেষমেশ বিধান হয় সব থেকে কম। সারা ভারতের গড় ৪১.৮ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে এই হার মাত্র ২২.৬ শতাংশ। একথা স্বীকার করা হয়েছে যে নারী অপহরণ ও যৌন নির্যাতনের (ে ত্রেও পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি বিধানের হার সারা দেশের তুলনায় অনেক কম। বামফ্রন্ট সরকার আইন-শৃঙ্খলা ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশের আরও (তি করেছে ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে। স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশেই গজিয়ে উঠেছে মদের দোকান। পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে আইনি-বেআইনি রিসর্ট, নাইট ক্লাব আর মধুচত্র(চালাবার হোটেল ও আস্তানা, যার অধিকাংশই চলে স্থানীয় সিপিএম নেতার মদতে। সম্প্রতি ইউনিসেফের রিপোর্টে জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে ৫ লাখ নারী পাচার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ নারী পাচার, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের স্বর্গদ্বার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একেই তো বলছেন আইন-শৃঙ্খলার 'মরূদ্যান', আর চোখের জল ত্যাগ করেছেন এই বলে যে অভাবে-দারিদ্রে রাজ্যের মেয়েরা বিপথগামী হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে নারীদের উন্নতির নামে এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস নারীদের উন্নতির জন্যে যে কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর জোর দিতে চায় সেগুলি হল—

- নারী, শিশু-সহ দরিদ্র ও দুর্বল মানুষদের জন্য সামাজিক সুর(া বলয় তৈরি করতে হবে
- নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বে মহিলাদের ৩৩ সংর(ণের ব্যবস্থা
- মহিলাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট গ্রুপ তৈরি করা
- স্বনির্ভর প্রকল্পগুলিতে মহিলাদের আগ্রহী করে তোলা ও আর্থিক সাহায্য দান
- সমবায় ব্যাংক পরিচালনায় মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে আসা
- তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক স্থিতি প্রদান করা
- মহিলাদের নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলা
- সর্বস্তরের মহিলাদের সামাজিক সুর(ার ব্যবস্থা করা

- চাকরিতে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া
- নিঃসহায় নারী ও শিশুদের সরকারি আশ্রমগুলির উন্নতিসাধন
- জেল ও পুলিশ হাজতগুলির উন্নতিসাধন
- জেল ও পুলিশ হাজতে বন্দীদের মানবিক অধিকার র(া
- নারী ও শিশুদের ওপর অত্যাচার রোধে বিশেষ ব্যবস্থাঅ
- মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সুর(ার ব্যবস্থা করা
- নারী পাচার রদ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া
- যৌনকর্মীদের অবহেলা না করে তাদের সামাজিকভাবে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার রাস্তা দেখানো

কমিশনগুলির সংস্কারের আশু প্রয়োজন

নির্বাচন কমিশন, মহিলা কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, তপশিলী জাতি-জনজাতি-অনগ্রসর কমিশন-সহ সমস্ত কমিশনগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কমিশনগুলিকে রাজনীতিমুক্ত(, শাসককূল মুক্ত(, স্বশাসিত কমিশনে রূপান্তরিত করতে হবে। কমিশনকে শক্তি(শালী ও মজবুত করার ল(্যে প্রয়োজনীয় পদ(েপ গ্রহণ করতে হবে।

- মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, তপশিলী জাতি, তপশিলী জনজাতি কমিশন প্রভৃতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আরও (মতাশালী ও সত্রি(য় করতে হবে এবং এদের সুপারিশগুলিকে আইনি বৈধতা দিতে হবে। সিবিআই-কে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত(একটি প্রকৃত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।
- মহিলাদের স্বার্থ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে দরদী উপযুক্ত(মহিলাদের নিয়ে তৈরি 'মহিলা কমিশন'।
- রাজ্যের জেলায় জেলায় মানবাধিকার আদালত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা

শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের জন্য

শারীরিকভাবে অ(ম সমাজের সেই সমস্ত মানুষদের কল্যাণে তৃণমূল কংগ্রেস অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে। শারীরিক অ(ম মানুষদের মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত(করে তাদের জীবনের মনোন্নয়ন ও কল্যাণে নানা প্রকার কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সহায়ক যন্ত্র প্রদানের (ে ত্রে রাজ্য সরকারের যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তা দূর করে সমস্ত শারীরিক অ(ম মানুষদের কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক পুনর্বাসনের প্রকল্প চালু করবে। এব্যাপারে 'ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপ্ট ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'-এর অন্তর্গত আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা সহজতর করবে ও ঋণদানের সুদের (ে ত্রে ন্যূনতম সুদের হারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়াও শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের চাকুরিতে পদ সংর(ণের যে নীতি আছে বর্তমানে এই রাজ্যে সেই নীতির বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ ব্যাপারে শারীরিকভাবে অ(ম মানুষ সংর(ণ পদের চাকরিতে যাতে যোগ দিতে পারেন তার জন্য উদ্যোগী হবেন।

বর্তমান মাসিক ভাতা বাজার মূল্যের সঙ্গে একদমই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের মাসিক ভাতা সাড়ে তিন হাজার টাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

শারীরিকভাবে অ(ম মানুষদের শি(া প্রসারে শি(া ও প্রশি(মের (ে ত্রে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শি(া প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও র(ণাবে(ণে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেবে।

উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য - উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন

রাজ্য মানবোন্নয়ন রিপোর্টের (২০০৪ পৃ. ৫) তথ্যানুযায়ী মানুষের উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নতিতে বিশেষ করে এই অঞ্চলগুলি বাম জমানায় ত্র(মশ পশ্চাদপদ থেকে পশ্চাদপদতর হয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা সহ পশ্চিমের তিনটি জেলা এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাম পরপর সাজানো বাগানের মত উঠে আসছে, স্বয়ং সরকার কর্তৃক ঘোষিত অনুন্নতের তালিকায়। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো উন্নয়নশীল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর জমানায় পিছিয়ে পড়েছে আরও চারটি জেলা। কলকাতা ছাড়া ১৮টি জেলার মধ্যে এখন ১০টি জেলাই পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে ৬৩টি জেলা শবর তার মর্যাদা হারিয়ে হতশ্রী (জনগণনা ২০০১ এর সিব অনুসারে।)

পাশাপাশি বুদ্ধবাবুর 'উন্নয়ন ও শিল্পায়ন'-এর নামে কলকাতার নির্মিত ফ্লাইওভার, নাইটক্লাব, বার, শপিং মল এবং রিসর্ট - এর রমরমা আরও পিছিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় বলে পরিচিত গ্রাম তথা মফঃস্বল শহরগুলিকে। এই শহর ও গ্রাম কেন্দ্রিক পারস্পরিক উন্নয়নের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহ, বিশেষত উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমের জেলাগুলির উন্নয়নের অঞ্চলগত প্রভেদ যে ত্র(মবর্ধমান এ কথা আজ স্পষ্ট এবং তার ফলে এই অঞ্চলের জনরোষ চরমে পৌঁছে গেছে। বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে এর প্রভাব ল(ণীয়। এইসব আপাতত শান্ত অঞ্চলের মানুষ নিঃশব্দে হয়ে উঠেছে (ি(প্ত ও আত্র(মণাত্মক। এই জেলাগুলিকে বেঁচে থাকার পর্বতপ্রমাণ চাপ প্রমাণ করে বামফ্রন্টের দেউলিয়া নীতিরই। এইসব অঞ্চলের ন্যূনতম উন্নয়ন ৩২ বছরে সরকার মনোযোগী হলে এই প্রবল অরাজকতা ও জনমনে অসন্তোষ দানা বাঁধত না, ঠেকানো যেত বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের উত্থান ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপও।

উত্তরবঙ্গ ঃ

বঞ্চনার শিকার না করে জনগণকে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম শর্ত, যেমন স্বাস্থ্য, শি(া, খাদ্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল সরকারের। নদী সংস্কার পরিকল্পনার উপযুক্ত(ব্যবস্থা নেওয়াও ছিল জ(রি। উত্তরবঙ্গে আলাদা উন্নয়ন পরিষদ স্থাপন করে শুধুমাত্র সিপিএম পার্টি কর্মীদের উন্নয়ন না করে জনগণের উন্নয়নে যত্নশীল হলে গড়ে উঠত না কামতাপুরী বা গ্রেটার কোচবিহারের অসন্তোষ। চা বাগানের জমি নিয়ে টাউনশিপ, শপিং মল গড়ার ল(্যে প্রমোটাররাজ কায়েম না করলে চা বাগানগুলির তীব্র অনাহার ঠেকান যেত যতটা সম্ভব। চা বাগানগুলির যথাযথ উন্নয়ন ঘটালে অনাহার তৈরিই হত না, ঠেকান

যেত মৃত্যু। পশ্চিমবাংলায় যেভাবে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল তৈরি করেছে এই সিপিএম সরকার তা এই শতাব্দীর লজ্জা।

রেলমন্ত্রী ও সাংসদ থাকাকালীন মমতা ব্যানার্জীর প(থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য নিয়ে যা যা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বা করা হয়েছিল, তার সামান্য কিছু উল্লেখ করা হল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইউনেসকো-র সর্বোচ্চ সম্মান ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্ট্যাটাসে ভূষিত। রায়গঞ্জ, কুচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ারে যাত্রীদের জন্য কম্পিউটারকৃত আর(ণ ব্যবস্থা। তিস্তা উপত্যকার সেবক গিরিখোলার মধ্যে রেল যোগাযোগের প্রস্তাব ও শিলিগুড়িতে রেল ওভার ব্রীজ, আন্ডার ব্রীজ। চ্যাংরাবাঁধা ও মালবাজারের মধ্যে অচল মিটার গেজ লাইনকে চালু করতে ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে ঘোষণা। একলাখি বালুরঘাট প্রকল্পের বিস্তার হিসাবে গাজোল থেকে ইটাহার পর্যন্ত একটি নতুন সংযোগ স্থাপন। কিষানগঞ্জ - ডালখোলা ডবল লাইনের জন্য বাজেট বরাদ্দ। নিউজলপাইগুড়ি - শিলিগুড়ি - নিউ বঙ্গাইগাঁও চলতি গেজ রূপান্তর দ্রুত সম্পূর্ণায়নের জন্য উচ্চ বরাদ্দ। নিউ ময়নাগুড়ি - যোগীঘোপা নতুন লাইন।

উত্তরবঙ্গের জন্য আরও যা যা করা দরকার ---

- ✿ উত্তরবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টের অপশাসনে চূড়ান্তভাবে বঞ্চনা আর অবহেলার শিকার হয়েছেন দীর্ঘকাল যাবৎ।
- ✿ তৃণমূল কংগ্রেস এর প্রতিকার করবে উপযুক্ত(পরিকাঠামো, শিল্প-বিনিয়োগ ও উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে।
- ✿ অবহেলিত উত্তরবঙ্গে কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকারের অন্যতম মিনি সেক্রে(টোরিয়েট স্থাপন করা হবে উত্তরবঙ্গে।
- ✿ চা-পর্যটন-পাট-কাঠ-তামাক শিল্প পুন(জ্জীবিত করে উত্তরবঙ্গের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। খাদ্য প্রত্রি(য়াকরণ শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।
- ✿ উত্তরবঙ্গের মালদা-সহ নদী ভাঙনরোধে বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে। তিস্তা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।
- ✿ এই রাজ্যের উত্তরবঙ্গ-সহ পশ্চিমাঞ্চলের যে জেলাগুলি রাজ্যের জন্য জেলার তুলনায় আর্থিকভাবে অনগ্রসর সেই সমস্ত জেলাগুলিতে ও সুন্দর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে বিশেষ তহবিল গঠন করে অতিরিক্ত(উৎসাহ ভাতা, অনুদান ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।
- ✿ উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ ডুয়ার্স ও আলিপুরদুয়ার নিয়ে বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের ব্যবস্থা, বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে।
- ✿ উত্তরবঙ্গ পর্ষদকে স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ হিসেবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় আইন ও পরিকাঠামো তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- ✿ উত্তরবঙ্গের জন্য সামগ্রিকভাবে বিশেষ যোজনা গ্রহণ।
- ✿ উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে আমাদের ল(্য, পাহাড়ে ও সমতলে শান্তি।

পশ্চিমাঞ্চল ঃ

এখানকার সব থেকে বড় সম্পদ বনাঞ্চল। বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে যদি পৌঁছে দেওয়া যেত খাদ্য, পরিবেশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শি(া তাহলে তৈরি হত না 'আমলাশোল'। উত্থান হত না মাওবাদের যার কারক একমাত্র সিপিএম। সাধারণ গরিব মানুষদের এই চরম দুর্গতি ঠেকাতে অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনার জিনিসপত্র, বিপিএলের সুযোগ সিপিএমের কালোবাজারিদের হাতে না গিয়ে যদি সঠিক মানুষদের হাতে পৌঁছতো, তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি(র উত্থান কখনওই হত না। সঠিক নদী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে কৃষি (ে ত্রে উন্নতিকরণ দূরের শুকতারা কখনওই নয়। উন্নয়নের নামে এম পি ল্যাডের টাকার নয়ছয় করা, বনজ সম্পদ থেকে এলাকার মানুষকে বঞ্চিত করা, সিপিএম-এর স্বজনপোষণ ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলোকে গরিব থেকে গরিবতর করে দিয়েছে। খাস জমির যথাযথ বন্টন না করা, দুর্নীতিতে ডোবা বামফ্রন্ট সরকারের সব থেকে বড় পাপ, যা এই অঞ্চলের মানুষগুলিকে করে তুলেছে (িপ্ত।

- ✿ জঙ্গল ও জঙ্গলের কেন্দুপাতা আদিবাসীদের প্রাণের ধন। জঙ্গল ও আদিবাসীদের যুগ-যুগান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে প্রাকৃত। জঙ্গল সম্পদ-নির্ভর আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ ও তাদের এই অধিকারকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে।
- ✿ পশ্চিমাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ, সেচ প্রকল্প ও শিল্প পরিকাঠামো গড়ে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু তা হবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

সুন্দরবন অঞ্চল ঃ

মূলত সংখ্যালঘু ও তপশিলী জাতি ও জনজাতি অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল বামফ্রন্টের অপশাসনের ও বঞ্চনার আর একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। নীতিহীন, পরিকল্পনাহীন সরকারি হস্ত(েপের ত্র(মাগত বিপর্যস্ত হয়েছে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য, এসেছে প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পুরো এলাকায় আছে মাত্র ৪০ কিমি রেলওয়ে আর ৩০০ কিমি সড়ক যোগাযোগ। না আছে কোনও সরকারি জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জল সরবরাহ এলাকার মানুষের কাছে আজও অলীক স্বপ্ন মাত্র। জীবিকা নির্বাহের (ে ত্র বলতে আছে কিছু এক ফসলি জমিতে চাষবাস, সামুদ্রিক মাছ আর জঙ্গলের মধু আহরণ ও বাগদা চিংড়ির চাষ। চিংড়ির চাষে নিয়োজিত হয় মূলত নারী ও শিশুরা। আত্র(ান্ত হয় তারা নানান রোগে আর কখনও বা বাঘ, কুমীর বা হাঙরের দ্বারা।

অতি ভঙ্গুর প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এই এলাকায় বামফ্রন্ট সরকার আন্তর্জাতিক জলপথ পরিবহণ ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের দিকে ঝুঁকেছেন। তাদের নিজস্ব রিপোর্টই (মানবোন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪ পৃ. ২০৩) বলছে এর ফল অতি বিপজ্জনক হবে।

- ✿ কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকারের বিশেষ তহবিল গঠন করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সমতলের পরিবেশ র(া ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
- ✿ এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভারসাম্যের প্র(েকে গু(ত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রূপায়ণে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ' গঠন

করা হবে তৃণমূল কংগ্রেসের আশু ল(্য।

- ✿ প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে স্থানীয় জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ✿ বিদ্যুতের বিকল্প উৎস ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
- ✿ নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে উন্মুক্ত(করতে নদী সংস্কার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

এই পরিপ্রে(িতে তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্তগুলি পূরণ করতে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা একান্ত দরকার। তার জন্য বিভিন্ন নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বিশেষভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলির জন্য —

- ✿ বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা
- ✿ উন্নয়নের বিশেষ পরিকাঠামো নির্মাণ
- ✿ সামাজিক উন্নয়নের (ে ত্র এবং গণবন্টন ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া
- ✿ স্থানীয় ও অঞ্চলগতভাবে কর্মশি(া ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- ✿ বেকার ও যুব সমাজের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উপর জোর দেওয়া
- ✿ স্থানীয় সম্পদ এবং স্থানীয় প্রযুক্তি(জ্ঞানের ব্যবহার করে বাজার, ব্যাংক এবং (ুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতিকরণ

পরিকাঠামো উন্নয়ন

রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন চূড়ান্ত অবহেলিত হয়েছে বামফ্রন্টের শাসনকালে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি পরিকাঠামো উন্নয়নের সূচকের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কে নিয়েছে ১২৯.৫, যেখানে সর্বভারতীয় গড় হল ১৪২। সারা ভারতে প্রতি ১০০ বিঘা জমিতে পাকা রাস্তা আছে ৮০ কিমি, আর পশ্চিমবঙ্গে আছে মাত্র ২০ কিমি। রাজ্যের মোট সব রকমের রাস্তার মাত্র ৫৭.৪ শতাংশ পাকা, আর অন্যান্য রাজ্যে অধিকাংশ রাস্তাই পাকা, যেমন, হরিয়ানায় ৯০.৭, গুজরাটে ৮৭.৩ পাঞ্জাবে ৮২.৫ ও মহারাষ্ট্রে ৭৫.১ শতাংশ। গ্রামের সঙ্গে পাকা সড়কের যোগাযোগের (ে ত্রেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অতি ক(ণ। প্রায় ৭১ শতাংশ গ্রাম কোনও পাকা সড়ক দ্বারা যুক্ত(নয়। তার ওপর আবার রাজ্যের ৫০ শতাংশ গ্রাম নিকটবর্তী শহর-বাজার বা গঞ্জ থেকে ২০ কিমি বা তারও বেশি দূরে অবস্থিত।

পরিবহন পরিকাঠামো ও তার রাজ্যব্যাপী বিস্তারজাল একই দুর্দশায়। রাজ্যের জেলাগুলি ও মফঃস্বল শহরকে যুক্ত(করে পরিবহণ বিস্তারজাল তৈরি করার কোনও পরিকল্পনাই গত ত্রিশ বছরে নেওয়া হয়নি। পণ্য পরিবহণের বিস্তারজালে ট্রাক টার্মিনালও যথেষ্ট সংখ্যায় নেই। কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই দু'চারটি তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আদৌ কাজে আসেনি। যেমন কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ট্রাক টার্মিনাল শূন্য প্রান্তরে -- পণ্য ওঠানো নামানোর ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি সেখানে। জনসাধারণের যাতায়াতে যাত্রীবহনের সরকারি ব্যবস্থাও দুর্দশাগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানবোন্নয়ন রিপোর্টই (২০০৪, পৃঃ ৮৪-৮৫) স্বীকার করেছে যে যাত্রীবহনকারী সরকারি বাসের সংখ্যার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ দেশের ১৬টি বড় রাজ্যের গড় থেকে পিছিয়ে আছে। সরকার

যাত্রীবহনের (ে ত্রে প্রায় কোনও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি - রাজ্যের মোট যাত্রীবহনকারী বাসের মাত্র ৯ শতাংশ সরকারি বাস। রাজ্যের আছে মোট ৮৪৫টি বাস(ট এবং দেখা যায় যে ১৪টি ব্লক স্তরে আছে একটি মাত্র বাস(ট। রাজ্যের অধিকাংশ ব্লক স্তরে যাত্রী পরিবহণে আছে মাত্র ২ থেকে ৫টি বাস(ট।

বিদ্যুতের জোগানের হিসাবেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় বছরে মাত্র ২০০ কিলোওয়াট ঘন্টা, যেখানে পাঞ্জাবে এর পরিমাণ ৯০০, গুজরাটে ৮০০ ও তামিলনাড়ুতে ৫০০ কিলোওয়াট ঘন্টা। উপযুক্ত(ভোল্টের বিদ্যুৎ ও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ মেলা রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে এক দুরূহ সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট (২০০৪, পৃঃ ৯) স্বীকার করেছে যে রাজ্যের মাত্র ৩১ শতাংশ বাসগৃহে বিদ্যুৎ যোগাযোগ আছে, সেখানে এর সর্বভারতীয় গড় হল ৪১ শতাংশ। একতরফাভাবে বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে কলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে একটি মাত্র সংস্থা সরকারের সাথে বোঝাপড়া করে মানুষের পকেট কাটছেন। সাধারণ পরিবার থেকে দোকানদার, কৃষিজীবী অঞ্চল থেকে শিল্পাঞ্চল সর্বত্র চলেছে সিপিএম দলের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার খেলা। জনগণ জানতেই পারছেন না যে মাসে মাসে কখনও ফুয়েল সারচার্জ -এর নাম করে, কখনও অ্যাডিশন্যাল সিকিউরিটির নাম করে, কখনও মিটারের গাফিলতির (জেনেশুনেই) সুযোগ নিয়ে এই কাজ চলেছে। এ সবের প্রতিকার কোনওদিনই বামফ্রন্ট সরকার করবেন না। কারণ বিদ্যুতের মাশুল তো আর সরকারের শুনতে হয় না, হয় সাধারণ মানুষের। সেই কারণে পশ্চিমবাংলায় কলকাতা থেকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হবে।

কলকাতার পরিকাঠামো ও নগরায়ন ঃ

সাংসদ হিসেবে মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগেই কলকাতাকে A1 সিটি ঘোষণা ও রবীন্দ্র সরোবরকে জাতীয় লেক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কলকাতা শহরতলি ও বৃহত্তর কলকাতার পানীয় জল থেকে শু(করে রাস্তাঘাট, বস্তির উন্নয়ন, ও সাধারণ এবং সর্বস্তরের মানুষের পরিষেবার উন্নয়নে কলকাতাকে যথার্থ A1 মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। একমুখী দু'একটা আবোল তাবোল ফ্লাই-ওভার করতে গিয়ে মূল কলকাতা ও তার প্রাণকে এক অন্ধকার কদর্য দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গড়িয়াহাট, তারাতলা, বা পার্কসার্কাস ফ্লাই-ওভারের নামে প্রদীপের আলোর নীচে কলকাতার মানুষকে রেখে দেওয়া হয়েছে এক ঘন অন্ধকারে। কলকাতা আমাদের গর্বের শহর। তাই কলকাতাকে উপযুক্ত(মর্যাদা ও গু(ত্বসহ প্রতিষ্ঠিত করতে তৃণমূল কংগ্রেস বদ্ধপরিকর।

বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর থেকে শু(করে অন্যান্য পৌরসভার অঞ্চলগুলিকে নতুন চেহারায়, উন্নতমানের পরিষেবায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। শহরাঞ্চল ঘিরে যে শিল্পাঞ্চল আছে, তার সাথে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। সেই জীবন ও জীবিকার সামাজিক, আর্থিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নতমানের সৃষ্টি, প্রযুক্তি(ও জ্ঞান, যা সারা বি(ে জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাকে আমরা নিয়ে আসব আমাদের প্রাণের শহর ও শহরাঞ্চলে। গ্রামোন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়েই এই উন্নয়ন আমরা আনব। যে সমস্ত বস্তিবাসী কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, তাদের উচ্ছেদ করে নয়, আবর্জনা ভেবে নয়।

তাদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে ওঠার সুবিধা ও বসবাসের ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা সহ রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে সামগ্রিক পরিকল্পনা নেবে সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে নিম্নলিখিত দিকগুলিতে -

- ✿ কলকাতা বন্দরের উন্নয়নে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।
- ✿ গঙ্গার ঘাটগুলিকে সংস্কার করতে হবে। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে সেই মতো পরিকল্পনা নিতে হবে।
- ✿ কলকাতার উন্নয়নের জন্য মিষ্টি পানীয় জল, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, শি(া, স্বাস্থ্য, বস্তি উন্নয়ন সহ কলকাতাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ও প্রকৃত অর্থে A1 সিটির জন্য সব ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার।
- ✿ সড়ক, রেললাইন, পরিবহন, যোগাযোগ, বাঁধ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি পরিকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে ও বিনিয়োগ আহ্বান করতে হবে।
- ✿ রাজ্যব্যাপী পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তারজাল - সড়ক ব্যবস্থা ও ট্রাক টার্মিনাল।
- ✿ পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তারজালের সঙ্গে সংযুক্ত(জেলাস্তরের স্থানীয় বাজার ব্যবস্থা।
- ✿ জেলা ও ব্লক স্তরে যাত্রী পরিবহণের সুবন্দোবস্ত।
- ✿ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন - জেলাগুলিতে উন্নতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিষেবার উন্নতি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী-গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ

জেলায় জেলায় প্রতি বছর বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যাজনিত (য়(তি রোধে বিশেষভাবে পরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখা হবে। রাজ্যের ৪২ শতাংশ এলাকাই বন্যাপ্রবণ। প্রায় প্রতি বছরই বন্যার ফলে রাজ্যের অসংখ্য মানুষ চরম দুর্দশায় পড়েন। ঘরবাড়ি, ফসল নষ্ট হয়, জীবনহানিও ঘটে। তাছাড়া গঙ্গার ভাঙ্গন, বিশেষত মালদহ আর মুর্শিদাবাদ জেলায়, ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অথচ গত ৩২ বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নদীভাঙ্গন রোধের কোনও সার্বিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথাই ভাবেনি। যেকটি প্রকল্প ছিল তাও রূপায়িত হয়নি, দু'একটি তো এই বামফ্রন্ট সরকার বাতিলই করে দিয়েছে। কংসাবতীর আধুনিকীকরণ, হয়নি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাতিল করা হয়েছে। কেলেঘাই, কপালে(ারী আর কাঁসাই নদীর সংস্কার প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়নি। প্রতি বছরই ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইছামতীর সংস্কারের কথা বলা হয়, কাজ হয় না। দুবদাবেসিনেরও একই হাল। দীঘা, শঙ্করপুরে ভাঙ্গন চলেছে, কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। নেই সুন্দরবন এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা।

বর্তমানে মাত্র দু'টি বৃহৎ নদী বাঁধ ও সেচ প্রকল্প চালু আছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে - তিস্তা ও সুবর্ণরেখা। বহু কাল আগে অনুমোদিত প্রকল্প দু'টি রাজ্য সরকার

আজও রূপায়িত করতে পারেনি। তিস্তা প্রকল্পের অনুমোদন হয়েছিল পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭৫-৮০) আর সুবর্ণরেখা প্রকল্পের অনুমোদন এসেছিল অষ্টম পরিকল্পনার (১৯৯২-৯৭) সময়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে পঞ্চম পরিকল্পনায় আরও ৫টি ও সপ্তম পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) ৩টি মাঝারি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল। নতুন প্রকল্প নেওয়ার কথা বাদই থাক, বামফ্রন্ট সরকার এগুলির কাজই সম্পূর্ণ করতে পারেনি। কারণটা সকলেরই জানা। স্থানীয় সিপিএম নেতা আর ঠিকেদাররা মিলে প্রকল্পগুলির টাকা লুঠপাট করে নিয়েছে, কাজ হবে কোথা থেকে।

পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা ইচ্ছা কোনওটাই বামফ্রন্ট সরকারের নেই। সাম্প্রতিককালে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট অবশ্য প্রচারসর্বস্বতাকে আশ্রয় করে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলতে শু(করেছে। কিন্তু সেখানেও তারা পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শুধুই চমক সৃষ্টিতে ব্যস্ত। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট কলকাতার বুকে কয়েকটি ফ্লাই-ওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, আর কলকাতা ও শিলিগুড়ির আশেপাশে কয়েকটি বেসরকারি উপনগরী স্থাপন করেই পরিকাঠামোর উন্নয়ন দেখাতে চায়। আদতে ষষ্ঠ বামফ্রন্টের তথাকথিত পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে শুধুই এইসব বড় বড় প্রকল্প নেওয়ার পিছনে কাজ করছে হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশি ঋণ ও তার নয়ছয় করার প্রলোভন।

প্রচারসর্বস্ব ও চিন্তাদর্শে সর্বস্বান্ত ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকরারের যথার্থ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনা নেই, সেই সদিচ্ছাও নেই। অথচ বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত পরিকাঠামোর উন্নতি ও রাজ্য জুড়ে বিস্তৃতি ছাড়া শিল্পায়ন বা উন্নয়ন কোনওটাই আর সম্ভব নয়। পাশাপাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক পরিকল্পনাও অতি জ(রি। এই উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক পরিকল্পনা নেবে যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে নিম্নলিখিত দিকগুলিতে -

- নদীভাঙ্গন ও বন্যা ভয়াবহতা আনে। রাজ্য যেহেতু নদীবহুল সেহেতু বন্যা ও নদীভাঙ্গন একটি গু(ত্বপূর্ণ সমস্যা। গঙ্গা-পদ্মা—এই অংশে ভাঙ্গন/বন্যা জাতীয় সমস্যা। পলি জমা-নদীব(সংর(ণ আর নদীগঙ্গা ভাঙ্গন রোধ করে জনজীবনে নিরাপত্তা ও জমির(ার প্রয়োজনে দরকার অর্থের। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের উদ্যোগে বিশেষ তহবিল গঠন করে এই সমস্যার মোকাবিলা করা দরকার।
- গঙ্গার ভাঙন রোধে প্রকল্পের উদ্যোগ এর আগে সাংসদ হিসেবে মমতা ব্যানার্জী নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এই প্রকল্প রূপায়ণকে বাস্তবায়িত করতে হবে।
- নদী ভাঙ্গনকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করতে হবে ও (তিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের দায় সরকারকে নিতে হবে।
- খরা-বন্যা প্রতিরোধে বিজ্ঞানসম্মত বীমা নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বীমা নীতি ঘোষণা করতে হবে।
- যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যের বর্তমান নদীপ্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা ও নদীভাঙ্গন এবং দীঘার সমুদ্র উপকূল ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- মালদহ ও মুর্শিদাবাদে ইছামতী থেকে ধূলিয়ান গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধে

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।

- রাজ্যের চিরাচরিত নদীগুলির সংস্কার ও র(া করা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নেওয়া।
- কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের র(ণাবে(ণ ও উন্নতি সাধনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা। আরও নতুন বন্দর তৈরি করে ব্যবসার বাজার বাড়ানোর সহায়তা করা।

এক নজরে তৃণমূল কংগ্রেস যা চায়

(১) ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত গরিব জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শি(া, বিনোদন, খেলাধূলা এবং নিয়মিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য বার্ষিক বাজেটে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ধনী ও উচ্চবিত্তদের ওপর কর বসিয়ে, কর ফাঁকি বন্ধ করে এবং কোটি কোটি কালো টাকা উদ্ধার করে অতিরিক্ত(অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

(২) দেশের সর্বত্র এবং সর্বস্তরে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বার্থে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(৩) বিচার বিভাগকে আরও সহজ ও সরল করতে হবে।

(৪) দেশে ধর্মনিরপে(মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করতে হবে। রাজনীতির ধর্মীয়করণ ও ধর্মের রাজনীতিকরণ কোনওটাই আমরা চাই না।

(৫) রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায় সীমিত অথচ অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্বই রাজ্যগুলিকে নিতে হয়।

(৬) তাই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব আদায়ে সীমা ও পদ্ধতি বদল করে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দিতে হবে।

(৭) বৃটিশের তৈরি কৃষকের স্বার্থবিরোধী ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ কৃষকের স্বার্থে সংশোধিত করা হবে। উর্বরা কৃষিজমি শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা চলবে না। চলবে না বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ।

(৮) ল(ল(ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ (ু ন্ন করে বৃহৎ ব্যবসায়ী বা বহুজাতিক সংস্থার শপিং মল করা চলবে না। খুব উন্নতমানের প্রযুক্তি(-সহ দেশের প(অপরিহার্য শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ চলবে না।

(৯) মহিলাদের আসন সংর(ণ বিলটি সংস্দ পাশ করতে হবে।

(১০) সমাজোন্নয়ন এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের আইনকানুন দেশের সর্বত্র কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এর জন্য আলাদা পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতিভেদ প্রথা দেশ থেকে যে কোনও মূল্যে চিরদিনের মত দূর করতে হবে।

(১১) বি(উষ(ায়ন (খতে ও 'গ্রীন হাউস গ্যাস' এর উদ্‌গীরণ (খতে আশু ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(১২) জল সংর(ণের সামগ্রিক প্রচেষ্টা শু(করতে হবে। 'ভূগর্ভস্থ জল যত্র তত্র উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

(১৩) এখনও দেশবাসীর বৃহত্তর অংশ কৃষিকর্মে নিয়োজিত। বিজ্ঞানীদের মতে আগামী দিনে সারা পৃথিবীতে খাদ্য সঙ্কট আসতে পারে। সেজন্য কৃষি(ত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে ও উন্নয়নের হার বার্ষিক ৫ শতাংশ করার ল(্যে সেচের ব্যবস্থাও করতে হবে এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের বীজ, জৈব ও অজৈব সার ও কীটনাশক ইত্যাদি উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি(ত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়মিত যোগানের জন্য সমবায় ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কঋণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত ও কর্মনিপুণ করে তুলতে হবে। বিভিন্ন শস্যের সংগ্রহমূল্য অগ্রিম বেঁধে দিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তা সময়মতো সংগ্রহ করে 'অভাবী বিক্রি(' র হাত থেকে ছোট কৃষকদের বাঁচতে হবে। দেশের প্রতিটি ব্লকে পূর্ণাঙ্গ শস্যবীমা চালু করতে হবে।

(১৪) শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণে আরও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হোক। রেল, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও সড়ক উন্নয়নে আরও বেশি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হোক। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে র(া করতে হবে।

(দ্র ও কুটির শিল্পকে আর শক্তি(শালী ও স্বনির্ভর করতে হবে। (গ্ন শিল্পের পুন(জ্জীবনের জন্য যথোপযুক্ত(ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকারকে র(া করতে হবে! কোনও অবস্থাতেই মালিকদের ইচ্ছামতো ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়া চলবে না।

(১৫) গণবন্টন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করতে হবে। নির্ভুল বিপিএল তালিকা তৈরি করে প্রত্যেক গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড দেওয়া হোক। অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনাকে সম্প্রসারিত করে গ্রামীণ দরিদ্রদের সকল অংশকে অন্তর্ভুক্ত(করা হোক। এন আর ই জি এ-র জব কার্ড প্রত্যেক ইচ্ছুক গ্রামীণ পরিবারের কাছে পৌঁছতে হবে।

(১৬) **গণবন্টন ব্যবস্থাকে দলতন্ত্র মুক্ত(করে মজবুত করার ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের গণবন্টন ব্যবস্থার দাবি জানাবে দল।**

(১৭) সংখ্যালঘুদের জন্য সাচার কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে। আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নতুন আইন অনুযায়ী।

(১৮) দেশের সার্বভৌমত্ব র(া করতে সেনাবাহিনীকে শক্তি(শালী করতে হবে ও তিন সেনাবাহিনীকেই আধুনিকীকরণ করতে হবে।

(১৯) আলিয়া মাদ্রাসার বি(েবিদ্যালয় নামকরণ করতে হবে।

(২০) প্রতির(া গবেষণায় জোর দিতে হবে যাতে প্রতির(া(ত্রে দেশ স্বয়ম্ভর হতে পারে। আত্মর(া ছাড়া অন্য কোনও কারণে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে।

(২১) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য একটি জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সন্ত্রাস দমনে কড়া আইন প্রণয়ন করতে হবে। সীমান্তপারের সন্ত্রাস বন্ধ করতে পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে হবে।

(২২) আমরা জোট নিরপে(বিদেশনীতি দৃঢ়ভাবে মেনে চলার প(ে। তবে মনে রাখা

দরকার যে বিদেশনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত দেশের প্রতির(া ও বাণিজ্যিক স্বার্থে। সেই ল(্যেই বিদেশনীতি পরিচালিত করতে হবে।

(২৩) অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যের পুলিশের বেতন কম। অন্য রাজ্যের মতো সমহারে বেতন বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। এখন যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারি কর্মচারীদের জন্য লাগু করছেন সেইহেতু রাজ্যেও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ২৭ মাসের বকেয়া বেতন বৃদ্ধির অর্থ দিতে হবে।

(২৪) **সমহারে কেন্দ্রীয় বেতন নীতি চালু করতে হবে।**

(২৫) তথ্য প্রযুক্তি(তে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মনিশ্চয়তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২৬) সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে অত্যাচার বন্ধ করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২৭) পিটিটিআই ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে।

(২৮) ফুলবাজার/মঙ্গলা হাট ও নন্দরাম মার্কেটের ব্যবসায়ী ও সংযুক্ত(মানুষদের দাবি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

(২৯) **সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের ৪০০ একর জমি ফেরত দিয়ে অধিকৃত ৬০০ একর জমিতে বি(ে বরাতের ভিত্তিতে শিল্প চাই।**

(৩০) ধর্মনিরপে(তা - মানুষমুখী উন্নয়ন নীতি সকলের জন্য চাই।

(৩১) প্রাকৃতিক সম্পদকে র(া করতে হবে।

(৩২) **স্বাধীনতা-সংগ্রামী-অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের পেনশনের হার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।**

(৩৩) গণতন্ত্রের স্বার্থে স্বচ্ছ-অবাধ নির্বাচন পরিচালনা এবং ত্রুটিমুক্ত(ভোটার তালিকা প্রণয়নের ল(্যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মীবাহিনী সমেত স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(৩৪) তথ্যের অধিকারকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে হবে।

(৩৫) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি সার্বিক জাতীয় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তবে রাষ্ট্রকে সদাজাগ্রত থাকতে হবে যাতে নিরাপত্তার নামে কষ্টার্জিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিঘ্নিত না হয় এবং কোনও স্বার্থান্বেষী যেন কখনও নাৎসি কায়দায় কোনও গোটা সম্প্রদায় ও জাতিকে নিরাপত্তার প(ে বিপজ্জনক বলে অভিযুক্ত(করে আত্র(মণ করতে না পারে। সীমান্ত পারের সন্ত্রাস (খতে আন্তর্জাতিক (ত্রে ভারতকে আরও সক্রি(য় হতে হবে।

(৩৬) দেশের সার্বভৌমত্বকে সুর(িত রাখার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতির(া বাহিনীর তিন বিভাগকেই আরও শক্তি(শালী ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতির(ার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের অস্ত্র ও প্রযুক্তি(র জন্য যাতে দেশকে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে না হয়, সেই ল(্যে প্রতির(া গবেষণা, প্রযুক্তি(ও উৎপাদনের (ত্রে দেশকে অবশ্যই স্বয়ম্ভর হওয়ার ল(্যে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

(৩৭) আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি ও দেশর(ার শক্তি(স্বীকৃতি লাভ

করলেও রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের প্রাপ্য স্বীকৃতি আজও অধরা রয়ে গেছে। এই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে।

(৩৮) দেশের সুর(া সার্বভৌমত্ব ও সম্মানকে সরলতর করা এবং আর্থ-বাণিজ্যিক মঙ্গলকে ত্বরান্বিত করার ল(্যকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালিত হবে দেশের বিদেশ নীতি।

(৩৯) দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফলকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজেকে দেশের উন্নয়নের একজন ভাগীদার (Stake holder) রূপে ভাবতে পারেন সেদিকে ল(্য রাখতে হবে। আর সেই ল(্যে ই রচনা করতে হবে জাতীয় উন্নয়নের রূপরেখা।

(৪০) বীমা - রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প র(া ও শক্তি(শালী করা।

(৪১) শপিং মলের খুড়োর কল বন্ধ করতে হবে।

(৪২) খুচরো ব্যবসাতে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ হবে।

(৪৩) বীমাসংস্থা বিলগ্নিকরণ করে বেসরকারি হাতে দেওয়ার বিরোধিতা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৪) ভবিষ্যনিধি তহবিলে আমানতকারী শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সুদের হার বৃদ্ধির দাবি করবে দল।

(৪৫) স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বৃদ্ধির দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৬) উন্নতমানের বীজ, সার সরবরাহ ও কালোবাজারি (খতে উপযুক্ত(ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৭) সংখ্যালঘু, মহিলা, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য চাকরির (েত্রে অগ্রাধিকারের দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রয়োজনে সংর(ণের দাবিও করা হবে।

ভারতবর্ষ বরাবরই রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ মেনে এসেছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন রাষ্ট্রপুঞ্জ ও নিরাপত্তা পরিষদের গণতন্ত্রীকরণ। ভারতবর্ষ যেন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে পারে তার নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে।

দ(িণ এশিয়ার সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের স্বার্থে সার্ক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস শুধু অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বাড়লেই দেশের উন্নয়ন হয় বলে মনে করে না। তার সাথে মানব উন্নয়ন সূচকেরও উন্নতি হওয়া দরকার। সেজন্য ব্যাপক শি(া ও স্বাস্থ্যের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। সকলের জন্য শি(া ও স্বাস্থের ল(্যে শি(ার কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ও স্বাস্থ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫ শতাংশ খরচ করতে হবে।

সারা দেশের কথা ভেবেও তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার প্রতি বিশেষ ল(্য রাখতে চায়। পশ্চিমবাংলার মানুষ যে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে, লোকসভার মাধ্যমে তা সারা দেশের মানুষকে জানাতে চায়, আবার পশ্চিমবাংলার সমস্ত আটকে থাকা প্রকল্প যাতে দ্রুত কেন্দ্রের অনুমোদন পায়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় চাপ সৃষ্টি করবে।

প্রার্থনা

ধ্বংসের কিনারা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে র(া করতে এবং জাতি-ধর্মনির্বিশেষে পশ্চাদপদ সমস্ত মানুষের জীবন-মানের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বৈরাচারী সিপিআই(এম) -এর দুঃশাসনের অবসান । এরা (মতাসীন থাকলে যে কোনও গণতান্ত্রিক প্রত্রি(য়ার বিকাশ অব(দ্ধ হয়ে যাবে।

তিন দশক ধরে অনুন্নয়ন , অধোগতি মানবতার লাঞ্ছনা , স্বৈরতান্ত্রিক সন্ত্রাসের ফ্যাসিবাদী শৃঙ্খলে বন্দী বঙ্গজননীকে মুক্ত(করে সাড়ে আট কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মৌলিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেওযার ল(্যে সার্বিক লড়াই করাই এই ত্র(ান্তিকালে তৃণমূল কংগ্রেসের নৈতিক অবস্থান। এরকমই এক ত্র(ান্তিকাল ১৯৩১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভাবীকালের উদ্দেশ্যে পথনির্দেশ করে বলে গিয়েছেন —''দাসত্ব, তা সে সামাজিক, অর্থনৈতিক যাই হোক, মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে নানা প্রকারের অসাম্যের সৃষ্টি করে। অতএব সাম্য সুনিশ্চিত করতে সমস্ত রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব দূর করতে হবে, আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ,সর্বাংশে স্বাধীন হতে হবে।'' দানবীয় ক্যাডার রাজের দাসত্ব থেকে বঙ্গবাসীকে মুক্তি(দেওয়াই তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি ও ল(্য। একে যারা নীতিহীনতা বলার অপচেষ্টা করছেন , দুর্নীতিই বোধহয় তাদের কাছে একমাত্র নীতি।

তাই মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সাড়ে আট কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবিধানিক পথে সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সিপিআই (এম) ও তার উচ্ছিষ্ট -ভোগীদের জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন করে জনমুখী উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ৩২ বছরের রা(স রাজত্বে সৃষ্ট (শ্মশানবাংলাকে সোনার বাংলায় পরিবর্তন করবার অঙ্গীকার করছে। সমস্ত বাধা অস্বীকার করে আসবেই সে পরিবর্তন।

পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএমের আসুরিক সরকারের বিদায় দামামা বেজেছে পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচনে। ২০০৯ সালের সংসদীয় নির্বাচন সাঙ্গ কর জাতীয় রাজনীতিতে সিপিআই(এম) -এর ''ফাউ মাতব্বরি''।

মহাত্মা গান্ধী -নেতাজী সুভাষ-মৌলানা আজাদ-বি আর আম্বেদকর-রবীন্দ্রনাথ-নজ(লের দেখানো পথে মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে তাপসী মালিক সহ শত সহস্র শহীদদের আশীর্বাদকে পাথেয় করে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে।

পরিবর্তনেই আসবে নতুন সকাল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় --- ''অন্ধকার দেখে ভয় পাওয়া চলবে না - বিপদ দল বেঁধে আসুক, রাত তো ভোর হয়েছে(ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে , মেঘের সিংহবাহনে।''

কাজী নজ(লের ভাষায় --- ''কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট, শিকল পূজার পাষাণ বেদী''।

আমরা মনে করি,

বাংলা আত্র(ান্ত
উন্নয়নের নামে চত্র(ান্ত
স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র
বনাম
আপনার সিদ্ধান্ত
বদলে দেবার সময় এবার

মিথ্যাচার একটানা,
বত্রিশ বছরের প্রতারণা,
সিপিএম দলতন্ত্রের মালিকানা
বনাম
আপনার বিবেচনা
বদলে দেবার সময় এবার

তৃণমূল কংগ্রেসের শপথ

এ প্রভাত আনবো আমরা, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন, নারী-পু(ষ নির্বিশেষে সকল পশ্চিমবঙ্গবাসী সম্মিলিতভাবে। ঘটতে দেব না কোনও সাম্প্রদায়িক বিভেদ। রবীন্দ্রনাথ-নজ(লের সোনার বাংলায় হতে দেব না কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘাত । ব্যর্থ করবো সিপিআই(এম) -এর প্রসাদজীবী 'যাত্রাপালায় বিরোধী সাজা' ছদ্ম দালালদের বিরোধী ভোট বিভাজনের মাধ্যমে সিপিআই(এম) -কে (মতাসীন রাখার মন্থরাবৃত্তিও।

আমরা আশা করব পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, নরহত্যা, নারীধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধের জন্য শান্তিপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী আগামী লোকসভার ভোটে বিপুলভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বেশী হলেই, রাজ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব, যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন সুনিশ্চিত হয় ।

জয়যুক্ত(ক(ন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের

এই চিহ্নে(**বোতাম টিপে ভোট দিন**

দিন বদলের পালা এবার, পালা বদলের দিন

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ ( )